চরৈবেতি

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

মুদ্রাকর : শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ : সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫১, ঝামাপুকুর লেন : কলিকাতা-৭০০০০৯

বড়মা-কে

শুশুনিয়া

'সাবধান সামনে গ্রাম।'

পথের ধারে সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়তেই বিস্মিত হই। সামনে গ্রাম বলে সাবধান হবার কি আছে? গ্রামকে ভয় পাবো কেন? আমরা তো শ্রীকান্তের 'নতুনদা' নই।

একটু ভাবতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সাবধান-লিপি পদযাত্রীদের জন্য নয়, মোটর চালকদের জন্য। সামনে গ্রাম সুতরাং সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে।

এই সংকীর্ণ পিচ্‌ঢালা পথটি বাকুড়া থেকে ছাত্‌না হয়ে পুরুলিয়া চলে গেছে। বাকুড়ার ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছাত্‌না। গতকাল রাতে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে আমরা আজ খুব সকালে ছাত্‌না নেমেছি।

ছাত্‌না এখন একটি প্রাচীন গ্রাম ও থানা সদর। প্রাচীন নাম ছত্রিনা। একদা ছত্রিনা একটি রাজ্যের রাজধানী ছিল। হামীর উত্তর ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রিনার রাজা হন। রেল থেকে নেমে আমরা তাই দল বেধে ছাত্‌না দেখেছি। তারপরে বাস ধরে শুশুনিয়া চলেছি।

কিন্তু শুশুনিয়ার কথা এখন থাক, ছাত্‌নার কথা হোক। ছাত্‌নার প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রায় ১৬০ ফুট দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট প্রস্থ ভাঙা প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা ভক্তকবি বড়ু চণ্ডীদাসের বাসলিদেবী মন্দিরের ভিত্তিবেদী ও ধ্বংসাবশেষ।

এখন শুধু ভিত্তিবেদী এবং তার পশ্চিমে কয়েকখানি পাথরের সিঁড়ি ও পাতলা ইটের একটুকরো দেওয়াল রয়েছে। বেদীর উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। দেওয়ালের ইটগুলো দেখবার মতো - মাত্র সাত ইঞ্চি লম্বা ও দু ইঞ্চি পুরু। অনেকগুলি ইটের গায়ে '১৪৭৫ শক' ও 'উত্তর হমির রাজা' এই কথা কয়টি খোদাই করা রয়েছে। তার মানে

১৪৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এটি বাঁকুড়া জেলার প্রাচীনতম ইটের তৈরি মন্দিরগুলির অন্যতম।

অনেকের মতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাই দেবীদাস এই মন্দিরের প্রথম পূজারী ছিলেন এবং ছাত্‌না বাংলার আদিকবি বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান।

এখন মূল-মন্দিরের দক্ষিণ-পুবে হরিনাম সংকীর্তনের জন্য একটি খোলা দালান তৈবি হয়েছে। সেখানে কিছু পুরনো ইট সাজানো রয়েছে। প্রাঙ্গণেব উত্তব-পূর্ব কোণে নবনির্মিত একটি ইটের কুঠুরিতে অবয়বহীন কয়েকখানি পাথব বাখা হয়েছে, তার একখানিকে বাসলি রূপে পূজা করা হয়।

দেবী বাসলিকে প্রণাম করে হাঁটতে হাটতে আমরা গিয়েছি গ্রামের দক্ষিণপ্রান্ত বাজগড় এলাকায়। সেখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও একটি নূতন মন্দিব বয়েছে। দুটিই ইটের তৈরি। নূতনটি দক্ষিণমুখী পঞ্চবত্ন মন্দিব। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সাড়ে ষোল ফুট এবং উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ফুট। গায়ে কিছু 'টেরাকোটা' মূর্তিসজ্জা রয়েছে। অবশ্য খুবই সাধারণ শিল্পকর্ম। মন্দিবটি ১৮৭৩ সালে নির্মিত।

এই মন্দিরেই আমবা বাসলি মূর্তি দর্শন করেছি। অনেকের মতে এটিই কবি চণ্ডীদাস সেবিত আদিবিগ্রহ। কালো পাথরের পাটার 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে ক্ষোদিত বিগ্রহ। কিছু ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। তবু তাঁকে শাক্তদেবী বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষীর ধ্যানমূর্তির সঙ্গে বাসলি মূর্তির মিল রয়েছে।

দেবী বাসলিকে প্রণাম করে আমরা বাসে উঠেছি। বাস এগিয়ে চলেছে শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে। ছাত্‌না থেকে শুশুনিয়া ৬ মাইল, এটি কাঁচারাস্তা। শুশুনিয়া ছাত্‌না থানার অন্তর্গত।

গন্ধেশ্বরী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছ'মাইল বিস্তৃত ও ১৪৪২ ফুট

উঁচু এই পাহাড়টি ইতিমধ্যেই পুরাতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৬৫ সালে এই পাহাড়টির পাদদেশে আদি প্রস্তরযুগে নির্মিত কয়েকখানি পাথরের কুঠার পাওয়া গেছে। ঐ একই সময়ে নিকটবর্তী মঠ ও বাগমুণ্ডিতে (পুরুলিয়া) আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রস্তরযুগের এবং তাম্রযুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই অঞ্চলে ব্যাপক খননকার্য আরম্ভ করেছেন। তাই মন্দিরহীন হয়েও মন্দিরময় বাঁকুড়ার দ্বিতীয় দর্শনীয় স্থান শুশুনিয়া। বলা বাহুল্য প্রথম স্থান বিষ্ণুপুরের।

কিন্তু আমি আজ পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্য দর্শন করতে শুশুনিয়া যাচ্ছি না। এমনকি চন্দ্রবর্মার শিলালিপি নিয়ে গবেষণা করতেও যাচ্ছি না। আমি চলেছি শৈলারোহণ শিক্ষাক্রম পর্যবেক্ষণ করতে। আমার সঙ্গে আছেন হিমালয়ান এসোসিয়েশনের বত্রিশজন সভ্য-সভ্যা। এদের মধ্যে তেইশজন শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের পাঁচজন মহিলা ও তিনজন বৃদ্ধ। কনিষ্ঠতম সুমন রায়, বয়স সতেরো। ওর প্রায় সমবয়সী তিনটি ছাত্রীও আছে রঞ্জনা বিশ্বাস, সুজাতা মজুমদার ও সুদীপ্তা সেনগুপ্তা। প্রবীণতম শিক্ষার্থী এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স বাহাত্তর।

দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটের সাহায্যে পূর্ব-ভারতে এই প্রথম রক্ ক্লাইম্বিং বা শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যক্ষ কর্নেল বি. এস. জশোয়াল কিছুদিন আগে নিজে এসে শুশুনিয়া পাহাড় পরিদর্শন করে গেছেন। তাঁর মতে, উচ্চতা যাই হোক, শুশুনিয়া 'রক্ ক্লাইম্বিং'-এর আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র। মাউন্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটের ইকুইপমেন্ট অফিসার বন্ধুবর শ্রী কে. পি. শর্মা এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা এবং বিখ্যাত শেরপা দা নামগিয়াল ও তাসী শিক্ষাদান করবেন। তাঁরা আগেই এসে গেছেন।

শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাংলো আছে। জোহান লিওনহার্ড রেন্স নামে একজন জার্মান ১৮৭৬ সালে এই বাংলোটি

নির্মাণ করেন। তিনি পাথরের ব্যবসা করতে এখানে এসেছিলেন। তখন নাকি শুশুনিয়া পাহাড়ে অনেক খনিজ সম্পদ পাওয়া যেত। পরবর্তীকালে শ্রীজগন্নাথ কোলে এই বাংলোটি ক্রয় করেন। তাঁরই সহৃদয়তায় আমরা এই বাংলোয় আশ্রয় পেয়েছি। স্থানীয় অঞ্চলপ্রধান শ্রীকরালীচরণ সরকার আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। বলতে গেলে আমরা তাঁরই অতিথি হিসাবে এখানে বাস করব। করালীবাবু ও স্থানীয় জনসাধারণকে তাঁদের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পর্বতারোহণ শিক্ষা প্রধানতঃ দুটি অংশে বিভক্ত—'রক্ ক্লাইম্বিং' ও 'আইস ক্র্যাফট'। এখানে বরফ নেই, কাজেই দ্বিতীয়াংশ শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু রক্ ক্লাইম্বিং বা শৈলারোহণ শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে আদর্শস্থান শুশুনিয়া।

রক্ ক্লাইম্বিং প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ক্লাইম্বিং বা আরোহণ ও 'র‍্যাপেলিং' বা দড়ির সাহায্যে অবতরণ।

ধরুন আপনি কোন পর্বতাভিযানে গিয়েছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন সামনে একটা পাথরের দেওয়াল, সেই দেওয়াল না পেরুলে এগোবার উপায় নেই। তখন খালি হাত-পায়ে সেই পাথরের দেওয়াল বেয়ে ওপরে ওঠাকেই রক্ ক্লাইম্বিং বলে। দেওয়ালের মধ্যে কোথায় একটু ফাটল বা ছিদ্র আছে, তাই খুঁজে নিতে হবে। তারপর সেখানে হাত বা পা দিয়ে ওপরে উঠে যেতে হবে। দু' পা একহাত অথবা দু' হাত এক পায়ের ওপর দেহের ওজন রেখে, এক হাত কিংবা এক পায়ের সাহায্যে ওপরে উঠতে হয়। তাই রক্ ক্লাইম্বিংকে 'থ্রি-পয়েন্ট ক্লাইম্বিং' বলে।

সব সময়েই আপনাকে যে নিরেট পাথরের খাড়া দেওয়ালের সম্মুখীন হতে হবে তার কোন মানে নেই। কখনও হয়তো দেখবেন সামনের দেওয়ালটি অসংখ্য ছোট ছোট ফাটলে বোঝাই। কখনও হয়তো মাঝারী আকারের ফাটল। যার মধ্যে অনায়াসে আপনি

নিজেকে গলিয়ে দিতে পারেন। এই জাতীয় ফাটল বেয়ে উঠে যাওয়াকে 'চিম্‌নি ক্লাইম্বিং' বলে। হাত পা হাঁটু ও পিঠের সাহায্যে ওপরে উঠে যেতে হয়। অনেক সময় গলির মতো বড় বড় ফাটলেরও সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে দুই দেয়ালের একটিকে বেছে নিয়ে থ্রি-পয়েন্ট ক্লাইম্বিং করে ওপরে উঠে যেতে হবে।

কেবল যে আপনাকে সোজাসুজি ওপরেই উঠতে হবে তার কোন মানে নেই। কখনও কখনও আড়াআড়িভাবে পাথরের দেওয়ালটি অতিক্রম করতে হয়। এই অতিক্রম করাকে 'ট্রাভার্সিং' বলে।

যেভাবেই হোক আপনি সেই পাথরের দেওয়ালের উপরে উঠে এসেছেন। উপরে উঠে দেখলেন নামবার কোন সহজ পথ নেই। দেওয়ালের ওপাশটাও তেমনি খাড়া। অথচ আপনাকে নামতে হবে। নইলে লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ পাবেন না। তখন সেখানে 'পিটন' (খিল) পুঁতে তার সঙ্গে 'ক্যারাবিনা' (আংটা--অনেকটা কপিকলের মতো কাজ করে) লাগিয়ে দড়ির সাহায্যে নিচে নেমে আসতে হবে। এই নেমে আসাকে র‍্যাপেলিং বলে।

র‍্যাপেলিং সাধারণতঃ ছয় প্রকার ঃ--শোল্ডার, লংস্লিং, শর্টস্লিং, সাইড্‌, স্টমাক ও রানিং।

শৈলারোহণ কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কলাকৌশলের যথাযথ প্রয়োগই সফলতা এনে দেয়। প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও সুলেখক ফ্র্যাঙ্ক. এস. স্মাইথের ভাষায়। '....Rock climbing is a strenuous exercise demanding skill, strength and steady nerves,....it is that skill, experience and rythm....than force and strength. To watch an expert at work is like watching an adept of the ballet ; a rythm consonant with the subject, a harmony in tune with the environment.'

রক্ ক্লাইম্বিংয়ের প্রথম প্রচলন করেন এ. এফ. মামেরী ১৮৮৬ সালে তার গ্রেঁপ (আলপ্‌স) অভিযান কালে। এখন অবশ্য ইওরোপ ও আমেরিকায় এমন সমস্ত যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে যে রক্ ক্লাইম্বিংয়ের সাহায্য ছাড়াই পর্বতারোহণ সম্ভব। কিন্তু পর্বতারোহীরা সেই সব যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির সাহায্য নিতে সম্মত হন নি। কারণ তাতে পর্বতাভিযানের মূল উদ্দেশ্যই বিফল হবে।*

বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় বাস এসে বাংলোর সামনে থামল। রাস্তার ডান দিকে বাংলো বাঁ দিকে গ্রাম। কলকাতা থেকে শুশুনিয়া এই ১৫৮ মাইল পথ আসতে আমাদের সাড়ে বারো ঘণ্টা লাগল। আমরা কাল রাত নটার ট্রেনে চেপেছি। অবশ্য এর মধ্যে ছাতনাতে আমরা চার ঘণ্টা সময় কাটিয়েছি।

বাংলোটি বেশ বড়, পাকা বাড়ি চারদিকে সেগুন বন। আধ মাইল দূরে একটি ঝরণা। স্থানীয়রা বলেন ধারা। এই ধারাই গ্রামের পানীয় জলের উৎস। কিন্তু ধারার উৎস এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। ধারায় বারমাস জল পড়ে। সুমিষ্ট জল। শীতে গরম, গ্রীষ্মে শীতল। হজমের মহৌষধ। পুণ্যবারি বলেও বিবেচিত। বছরে তিনটি মেলা বসে এখানে। পুণ্য লোভাতুর নরনারীরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে বহুদূর থেকে এসে এর জল নিয়ে যান।

চা পানের পর সকলে পর্বতারোহণের পোশাক পরে সারি বেঁধে বাংলোর প্রাঙ্গণে দাঁড়ালেন। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শিক্ষাক্রমের উদ্বোধন করা হলো। তেইশ-জন শিক্ষার্থীকে রোপ বা দলে ভাগ করে নেওয়া হলো। শ্রীশর্মা নিজেই প্রথম রোপের শিক্ষক হলেন। দ্বিতীয় রোপের শিক্ষক

---

*প্রাণেশ চক্রবর্তীর 'রক্-ক্লাইম্বিং' ও সুনীল চৌধুরীর 'পাহাড় পাহাড় খেলা' বই দু'খানি দ্রষ্টব্য।

হলেন দা নামগিয়াল। তৃতীয় রোপে—তাসী। নিতাই রায়, প্রাণেশ চক্রবর্ত্তী ও অমূল্য সেন তাঁদের তিনজনকে সাহায্য করবে।

শ্রীশর্মার বক্তৃতার পর শিক্ষার্থীরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন। বাংলোর পরে প্রথম শ খানেক গজ প্রায় সমতল। সেগুন বনের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ। তার পরেই চড়াই শুরু। কাটা গাছ ও ঘাসে বোঝাই একটা গিরিশিরা ধরে ওরা পাহাড়ের চূড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। চুড়োর ঠিক নিচেই, প্রায় পাশাপাশি, শিক্ষাদানের উপযোগী কয়েকটি রক্ আছে। দু'ধারেই শিয়াকুল বা ঐ জাতীয় বড় বড় জংলা গাছ। সেগুন গাছ বেশ কমে এসেছে। বন বিভাগের পরিচালনায় পাহাড়ের অপর পার্শ্বে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সেগুনের চাষ করা হয়েছে। পুরো পাহাড়টি বন বিভাগের অধীনে।

প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের কেবল ক্লাইম্বিং শেখানো হলো। ওরা বেলা প্রায় দেড়টার সময় বাংলোতে ফিরে এলেন। খাওয়া ও স্নানের জন্য দেড় ঘণ্টা ছুটি, তারপরেই আবার ক্লাস—'নটিং' বা গ্রন্থি বন্ধন। চলতি কথায় গাঁট বাঁধা শেখানো। গাঁটছড়া যেমন সমাজের জীবন, গাঁট বাঁধা তেমনি পর্বতাভিযানের জীবন। কোমরে দড়ি বেঁধে দুর্গম ও দুস্তর পথে এগিয়ে যাওয়াই পর্বতাভিযান। এই দড়ি বাঁধার কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে—বহু রকমের গাঁট আছে। শিক্ষার্থীরা সকলেই সাফল্যের সঙ্গে এই গাঁট বাঁধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সন্ধ্যের পরে শ্রীশর্মা পাহাড়ের নানাবিধ বাধা ও বিপদ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন।

পরদিন ভোর পাঁচটায় বেড্‌টি খেয়ে শিক্ষার্থীরা পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। অমূল্য সেন বাঁশি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের রুকস্যাক পিঠে মার্চ শুরু করলেন। আজ তাঁদের র‍্যাপেলিং শিক্ষা দেওয়া হলো। ওরা বাংলোয় ফিরলেন বেলা প্রায় দুটোর সময়। খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁবু টাঙানোর মহড়া। শিক্ষার্থীদের পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাসী।

তারপরে 'KNOW THY RAMNATHPUR' অর্থাৎ করালীবাবুর গ্রাম রামনাথপুরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ওরা পথে বেরিয়ে পড়লেন। ঘণ্টা দুয়েক টহল মেরে বাংলোয় ফিরলেন সন্ধ্যের সময়। বসল আলোচনার আসর। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হলো ক্যাম্প ফায়ার বা আনন্দের আসর - ভ্যারাইটি পারফর্ম্যান্স, পর্বতাভিযানের শেষ দিনে মূল শিবিরে আগুন জ্বালিয়ে যেমন স্ফূর্তির আসর বসে --তারই অনুকরণে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন।

তৃতীয় দিনে ক্লাইম্বিং ও র‍্যাপেলিং শিক্ষা দেওয়া হলো। তারপর শিক্ষার্থীরা ফিরে এলেন বাংলোয়। খাওয়া-দাওয়ার পরে 'ক্রিভাস রেসকিউ' বা খাদ থেকে উদ্ধারের মহড়া। মহড়ার পরে শ্রীশর্মা শিক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ নিলেন। অর্থাৎ এই শিক্ষাক্রম সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানলেন। সন্ধ্যার পরে সিনেমা দেখানো হলো।

আপনাকে যদি কোন তুষারাবৃত অজানা প্রান্তরে তাঁবু ছাড়া রাত কাটাতে হয়—তা হলে কেমন লাগবে আপনার? আমি কথা দিচ্ছি খারাপ লাগবে না। আর পর্বতাভিযানে এরকমভাবে রাত কাটাতে বাধ্য হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এক শিবির থেকে আর এক শিবিরে যাওয়ার পথে, কিংবা পথ খুঁজতে গিয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে পথ হারিয়ে, এরকম অবস্থায় পড়া অস্বাভাবিক নয়। তাই শ্রীশর্মা শিক্ষার্থীদের যার যা সম্বল আছে তাই দিয়েই তাদের রাতের আশ্রয় তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। এই আশ্রয় নেওয়াকে ইংরাজীতে বলে বিভোয়াক (Bivouac) করা। বাংলোর পাশে সেগুন বনের মধ্যে শিক্ষার্থীরা বিভোয়াক করলেন। সবচেয়ে সুন্দর হলো শ্যামসুন্দর অধিকারীর আশ্রয়টি। তারপরেই আমার ভাল লাগল অমিতাভ দাশগুপ্ত ও অসিত বসুর আশ্রয় দুটি। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বাইরে রাত কাটালেন তাঁরা। কিন্তু সকলেরই নাকি রাত্রে খুব ভাল ঘুম হয়েছিল।

২৬শে জানুয়ারী। আজ শিক্ষাক্রমের শেষ দিন। অঞ্চলপ্রধান শ্রীকরালীচরণ সরকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। জাতীয় সংগীত গেয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হলো। আজ প্রথমে র‍্যাপেলিং ও পরে চিমনি ক্লাইম্বিং শেখানো হলো। শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা শুশুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে বাংলোয় ফিরলেন। আর আমি, গৌতম, বাণী, মিতা ও প্রাণেশ করালীবাবুর নাতি বিধানের সঙ্গে শিলালিপি দেখতে চললাম।

শুশুনিয়া পাহাড়ের অপরপ্রান্তে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে শিউলী-বোনা গাঁয়ের শ-খানেক ফুট ওপরে, দুটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিলালিপি আছে। সংস্কৃত ভাষায় ও গুপ্ত-লিপির পূর্বাঞ্চলীয় হরফে গুহার দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে—

'চক্রস্বামিনঃ দাস (।) (৫) গ্রণঃ (।) তি সৃষ্টঃ
পুস্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহ বর্মনঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ।'

মানে, চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক উৎসর্গীকৃত, সিংহবর্মার পুত্র পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মার অনুষ্ঠান।

এই শিলালিপি চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। এটি বাঁকুড়া জেলাকে বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পোখর্না বা পাখন্না গ্রামই শিলা-লিপির পুষ্করণা। এই পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মাই সেকালে রাঢ়াধিপতি ছিলেন। অনেকের মতে এই চন্দ্রবর্মাই এলাহাবাদ শিলা-লিপিতে বর্ণিত সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা। আবার অনেকের মতে দিল্লীর লৌহস্তম্ভ এই চন্দ্রবর্মারই কীর্তি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা পর্যন্ত চন্দ্রবর্মনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

পাহাড়ের গায়ে একটি বেশ বড় চক্র ক্ষোদিত। চক্রের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার প্রদীপ। চক্রের ডানদিকে তেরটি অক্ষরের একসারি ও

নিচে দু'সারিতে ওপরের শিলালিপিটি ক্ষোদিত। প্রথম সারিতে উনিশটি ও দ্বিতীয় সারিতে পনেরোটি অক্ষর।

দ্বিতীয় লিপিটিতে একই হরফে লেখা রয়েছে—'চক্রস্বামিনো ধোসোগ্রামোত্রিস্সৃষ্ট'। অর্থ ধোসো গ্রামের চক্রস্বামীকে উৎসর্গ করা হল। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুই চক্রস্বামী।

যেখানে শিলালিপি দু-টি ক্ষোদিত আছে সেটি পাহাড়ের স্বাভাবিক গা নয়। এর মসৃণতা মনুষ্যসৃষ্ট। মনে হয় সেকালে এটি একটি প্রকাণ্ড গুহা ছিল। কালক্রমে গুহাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন শুধু গুহার একদিকের দেওয়ালটি অবশিষ্ট রয়েছে।

বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি সমূহের অন্যতম শুশুনিয়ার গুহালিপি দুটিকে দেখে ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়। ফেরার পথে আমরা পাহাড় ডিঙিয়ে ওপার থেকে এপারে নেমে এলাম। ফলে শুশুনিয়া পাহাড়ের সবটাই দেখা হয়ে গেল আমাদের।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে নিল। শিক্ষাক্রম শেষ হয়েছে, শুশুনিয়ার পাট চুকেছে। এবার বিদায়ের পালা। সবাই বাংলোর প্রাঙ্গনে সারি বেঁধে দাঁড়ালেন। শ্রীশর্মা ও শিশিরদা সবাইকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু সভা ভঙ্গ হলো না। তিন নম্বর রোপের নিত্যানন্দ দত্ত এসে দাঁড়াল সবার সামনে। আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। নিত্যানন্দ বলল, "মধুরেণ সমাপয়েৎ— কথাটা আমরা বাস্তবে পরিণত করতে চাই। তাই আমাদের রোপ থেকে চাঁদা তুলে আমরা একটু মিষ্টি মুখের আয়োজন করেছি। আপনারা অনুমতি করলে পরিবেশন শুরু হতে পারে।"

আমরা সানন্দে সমস্বরে অনুমোদন করলাম। পরিবেশন শেষ হলো। কিন্তু নিত্যানন্দ এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন? স্বভাবতই প্রশ্ন করি "কি হে তোমার কি আরও কোন সন্দেশ আছে নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" সে বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয়।

"কী ?"

"একটা টি পার্টির নেমন্তন্ন।"

"কবে ? কখন ? কোথায় ?"

"আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়, আমার বাড়িতে।"

"উপলক্ষ ?"

"বৌভাত।"

"কার ?"

নিত্যানন্দ মাথা নত করে। লাজনম্রস্বরে কোন মতে জবাব দেয়, "আমার।"

'নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল ; এই ত্রিকোণ-ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল ! অট্টালিকা আমূল-শিরঃপর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত ; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত।'

সেই দুর্গ দেখতে এসেছি আমরা। সকাল সাতটায় বাস ছেড়েছে হাওড়া থেকে একখানি নয়, চারখানি বাস। পথে উত্তরপাড়ায় কিছুক্ষণ থেমে চা বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করেছি। তারপরে একটানা প্রায় ঘণ্টা তিনেক চলে পৌঁছেছি এখানে বীরেন্দ্র সিংহের গড়-মান্দারণে।

গড়-মান্দারণের অবস্থান প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে লিখেছেন—

'যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল।······গড়-মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এইজন্যই তাহার নাম গড়-মান্দারণ হইয়া থাকিবে।'

কিন্তু হায়, কোথায় সেই কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত বৃহৎ দুর্গ ! নেই সে বহুকাল। ছিল না শতবর্ষ আগে সাহিত্য-সম্রাটের 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালেও। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—তখন নাকি দুর্গের নিম্নভাগ বর্তমান ছিল। আজ তারও কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। সাহিত্য-সম্রাটের সময়ে এখানে বহুবিস্তৃত বন ছিল। সাপ ভালুক ও

অন্যান্য হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল এখানে। এখন সেই বন কেটে ক্ষেত হয়েছে। চাষাবাদ করা হয়েছে। এই সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের মাঝে আড়াআড়িভাবে কেবল ছুটি অনুচ্চ মাটির ঢিপি রয়েছে পড়ে। আর তাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শান্ত-স্বচ্ছ একটি ক্ষীণ জলধারা—প্রবল নদী আমোদরের বর্তমান রূপ। বাঁকুড়া জেলা থেকে সৃষ্ট হয়ে গড়-মান্দারণের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঘাটাল মহকুমার দ্বারকেশ্বরে গিয়ে মিলেছে।

আমোদরের অপর পারে ঘাস কাঁটাগাছে ছাওয়া একটি টিলা। উচ্চতা ও আকৃতিতে এপারের ঢিপি ছুটির চেয়ে বড়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এপারের ঢিপি থেকে ওপারের টিলা পর্যন্ত ছিল গড়-মান্দারণ। কেন জানি না, এই অংশটুকুতে চাষাবাদ করা হয় নি। হয়তো এর নিচে রয়েছে ছুর্গের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু বোঝার উপায় নেই। তৃণাচ্ছাদিত সাধারণ একটি ময়দান। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে গুটিকয়েক বড় বড় গাছ। তারই একটির ছায়ায় একদল মেয়ে-পুরুষ শতরঞ্জি বিছিয়ে মাইক সহযোগে গ্রামোফোন বাজাচ্ছেন। অস্ত্রের ঝনাৎকার নয়, বিশুদ্ধ বোম্বাই সংগীত—'বোল্ রাধা বোল্'...। কাছেই রান্না চড়েছে। তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বীরেন্দ্র সিংহের গড়-মান্দারণ আজ চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। ইতিহাসের কি বিচিত্র বিধান!

আমোদরের হাঁটু-জল পেরিয়ে আমরা অপর পারে এলাম। পায়ে-চলা পথ বেয়ে উঠে এলাম টিলার ওপরে। বিরাট বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ইট আর পাথরের তৈরি অর্ধভঙ্গ একটি সমাধিবেদী। জায়গাটা বেশ উঁচু। কাছেই চারিপাশে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়।

এই সেই গড়-মান্দারণের অবশিষ্টাংশ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতর থেকে। মনে পড়ে—বীরেন্দ্র সিংহ ও বিমলার কথা। মনে পড়ে—অভিরাম স্বামী, কতলু খাঁ, ওসমান ও আয়েষা,

জগৎ সিংহ ও তাঁর হৃদয়মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী তিলোত্তমার কথা। আর মনে পড়ে—'নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর-সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল; আম্র-কানন দোলাইয়া আমোদর স্পর্শ শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।'

জীর্ণ পোষাক পরিহিত একজন মধ্যবয়সী মুসলমান নিজেকে 'গাইড' বলে পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, "শা ইসমাইল গাজী গঞ্জস আরস ও শা ইসমাইল গাজী গঞ্জল গলন নামে বীরেন্দ্র সিংহের দুজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁরা পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। এটি আরসের সমাধিস্থল। গলনের সমাধি এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। পৌষ-সংক্রান্তিতে মেলা বসে এখানে। বহু দূর থেকে বহু লোক আসে সে মেলায়। তবে বীরেন্দ্র সিংহের কোন উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিহ্নই এখন আর নেই এখানে। কেবল ঐ যে বটগাছটা দেখছেন", লোকটি অনেক দূরে, প্রায় বড় রাস্তার ধারে, একটি গাছ দেখিয়ে বলেন, "ঐখানে ছিল বীরেন্দ্র সিংহের হাতি ও ঘোড়াশাল। আর ঐ যে ছোট ঢিপির মতো উঁচু জায়গাটা দেখছেন, ওখানে ছিল মস্ত উঁচু এক মিনার। এখান থেকে মাইল খানেক দূরে এখনও কাজলাদীঘি নামে একটি মজে আসা জলাশয় আছে। আমোদরে স্নান সেরে কাজলাদীঘি থেকে পদ্ম নিয়ে বিমলা যেতেন শৈলেশ্বরের মন্দিরে।"

দুর্ভাগ্য আমাদের ঠিক অবস্থানটি না জানায় আসার পথে শৈলেশ্বরের মন্দির দেখতে পারি নি। যাবার সময় রাত হয়ে যাবে। কারণ এখান থেকে আমরা যাব জয়রামবাটি। সেখান থেকে কামারপুকুর হয়ে আজই কলকাতায় ফিরব। কাজেই এ যাত্রায় আর আমাদের বীরেন্দ্র সিংহের ইষ্ট-দেবতা শৈলেশ্বরকে দর্শন করা

হলো না। দেখতে পারলাম না জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমার সেই প্রথম মিলন-মন্দিরকে।

কিন্তু সত্যই সেখানে তারা মিলিত হয়েছিল কি? পণ্ডিতদের মতে কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বীরেন্দ্র সিংহ নামে নাকি কেউ কোন কালে ছিলেন না এখানে। তাঁরা বলেন—আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার এই গড়-মান্দারণ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। মুসলমান রাজত্বকালে এখানকার নাম ছিল 'বিধুর গড়'। একদা এখানে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। রাজপ্রাসাদ বা দুর্গের প্রাচীর ছিল পাঁচ মাইল বিস্তৃত, উচ্চতা ছিল বিশ থেকে ত্রিশ ফুট। হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজি মান্দারণের হিন্দু রাজা গজপতিকে পরাস্ত করে এই গড় দখল করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের পূর্বেই তিনি ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের হাতে নিহত হন।

আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল লিখেছেন, সেকালে মান্দারণের অন্তর্গত হাজিয়া নামক স্থানে হীরা পাওয়া যেত। সে আমলে এ অঞ্চলের নাম ছিল সরকার মান্দারণ বা মান্দার। ষোলটি মহল ছিল এই সরকারে।

মান্দারণে পারস্য ভাষায় লেখা কয়েকখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তার একখানিতে উৎকীর্ণ আছে—'বিঘাভর জমিন—কুলাভর ধান।' অর্থাৎ এক বিঘা জমির জন্য মাত্র এককুলো ধান রাজস্ব বরাদ্দ ছিল। 'হায়রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।'

কিন্তু কালিদাসকে নিয়েও তো ঐতিহাসিকদের গবেষণার শেষ নেই। অথচ এই গবেষণায় বৃথা কালক্ষয় না করে, তাঁরা যদি মহাকবির কাব্যে মনোনিবেশ করেন, তা হলে অনেক বেশি উপকৃত হবেন। তাই পণ্ডিতরা যা-ই বলুন, আমাদের কাছে দুর্গেশনন্দিনী পরমসত্য। কারণ 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' বাল্মীকির 'মন-ভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য…।'

ইতিহাসের গড়-মান্দারণ ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গড়-মান্দারণ আজও আছে বেঁচে—থাকবেও চিরকাল।

ধান কাটা হয়ে গেছে। আমরা সেই শস্যহীন কৃষিক্ষেত্র পেরিয়ে উঠে এলাম বড় রাস্তায়। আমোদর পুলের কাছে এসে বাসে উঠলাম। এই পুলটিকে বলে লালবাঁধ। পুল পেরিয়ে পথটি চলে গেছে আরামবাগ। সারা বছর মোটর চলে।

কিছুকাল আগেও কলকাতার সঙ্গে এ অঞ্চলের সম্পর্ক নিবিড় ছিল না। যাতায়াত ছিল কষ্টকর। কিন্তু এখন ভাল ভাল রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। তারকেশ্বর ও আরামবাগ থেকে নিয়মিত বাস চলাচল করছে। শুধু রাস্তা-ঘাট নয়, চাষাবাদেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এই অঞ্চলে, বিশেষ করে আরামবাগ মহকুমায়।

ফসল উঠে গেছে কিন্তু পথের দু ধারে তরি-তরকারির বাগান এখনও বোঝাই। দু চোখ ভরে দেখবার মতো। আশেপাশের মহকুমার চেয়ে এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য অনেক কম। যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আরামবাগ আজ এমন সুজলা সুফলা হয়ে উঠেছে, তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

আবার আমরা বেঙ্গাই চৌরাস্তার মোড়ে এলাম। এখান থেকেই কাঁচা মাটির পথ ধরে আমরা লালবাঁধে গিয়েছিলাম। এবারে আবার বাঁধানো রাস্তা ধরে চললাম এগিয়ে। বেঙ্গাই থেকে কামারপুকুর এগারো মাইল আর জয়রামবাটি চোদ্দ মাইল। কিন্তু আমরা এখন সোজা জয়রামবাটি যাচ্ছি। ফেরার পথে কামারপুকুর দর্শন করব।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা জয়রামবাটি গ্রামে প্রবেশ করলাম। গ্রামের প্রান্তে পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় এসে বাস থামল। বিশাল জলাশয়, চমৎকার জল। নাম—'মায়ের ঘাট'।

শ্রীমা সারদামণির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই জলাশয়। জলদানের চেয়ে বড় পুণ্য নেই এদেশে।

'মায়ের মন্দির' এখন বন্ধ হয়ে গেছে। খুলবে সেই বিকেল চারটেয়। কাজেই এখন আমাদের অফুরন্ত অবসর। এই অবসরে চারিদিকটা ঘুরে দেখতে হবে আর স্নান-খাওয়া সেরে নিতে হবে।

এমন সুযোগ সহজে আসে না তাই মনের আনন্দে সাঁতার কেটে স্নান সেরে নেওয়া গেল। তারপরে পুকুর পাড়ে শতরঞ্জি বিছিয়ে খাওয়ার পাট শুরু হলো—রুটি আলুর দম, রাজভোগ ও কমলালেবু। এ জায়গাটি চড়ুইভাতির পক্ষে চমৎকার। কিন্তু আমরা সংখ্যায় দেড় শতাধিক। এত লোকের রান্নার ব্যবস্থা করা সহজ নয়। তাই আমরা খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আরও কয়েক দল দর্শনার্থী আজ এসেছেন এখানে। তাঁদের একটি দল একটু দূরে গাছের ছায়ায় খিচুড়ী চাপিয়েছে। লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পাঁউরুটি চিবুচ্ছি আমরা। আর কয়েকটা কুকুর ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে দু'দিকেই তাকাচ্ছে।

খাওয়া সেরে ঢেকুর তুলে বেরিয়ে পড়েছি পথে। পুকুর পাড় দিয়ে আমরা ঘাটের সামনে আসি। তিনটি পথ এসে মিলেছে এখানে। এখানে কয়েকটি চা ও মিষ্টির দোকান আছে—স্বভাবতই দর্শনার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন দোকানে।

মায়ের ঘাট থেকে রাস্তাটি কিছুদূর এসে বাঁয়ে বেঁকেছে। দু'পাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি—মাটি ও খড়ের তৈরি। দুয়েকখানি টিনের বাড়িও আছে। দেখতে বড়ই সুন্দর—যেন পটে আঁকা ছবি।

বাঁয়ে কয়েক পা এগিয়ে ডাইনে শ্রীমার নতুন বাড়ি। পথের পাশে ছোট ফটক। ভেতরে ঢুকে ডাইনে দু'খানি ও বাঁয়ে একখানি ঘর। তার পরেই পুবদিকে একটি দীঘি—পুণ্যপুকুর। বাঁদিকের বারান্দাযুক্ত ছোট ঘরখানাতেই শ্রীমা থাকতেন। ১৯১৬ সালের ১৫ই মে থেকে ১৯২০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতে বাস করে-ছিলেন। তখন এটি খড়ের ঘর ছিল। পরে তাঁর সেবক পূজ্যপাদ

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এখনকার মেঝে বাঁধানো টিনের ঘরখানি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

ঘরখানি দোতলা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। সামনের দিকে একটি দরজা ও দুটি জানলা। দরজা বন্ধ তবে জানলা খোলা আছে। ঘরের ভেতরে শ্রীমার ফটো—ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। ফটোর সামনে পুজোর উপকরণ।

আরও কয়েক পা এগিয়েই বাঁদিকে বিশাল মন্দির—মাতৃমন্দির। ১৮৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সারদামণি এই পুণ্যক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। অখ্যাত জয়রামবাটি শক্তিপীঠে পরিণত হয়।

স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের জন্মস্থান তথা পৈতৃক বাস্তুভিটার ওপরে ১৯২৩ সালের ১৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার অক্ষয় তৃতীয়াতে এই মন্দির নির্মাণ করান। সারদামণি ১৮৬২ সাল অর্থাৎ ন'বছর বয়স পর্যন্ত এই ভিটায় বাস করেছেন। এখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এখানেই তিনি তাঁর বহু সন্তানকে মহামন্ত্র, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দান করেছেন।

মাতৃমন্দিরের সামনে সরু পিচ-ঢালা পথ, পথের পাশে ফুলের বাগান। উল্টোদিকে বইয়ের দোকান ও রামকৃষ্ণ মিশনের অফিস। মিশনের সেবাকার্যের ফলে জয়রামবাটির অনেক উন্নতি হয়েছে।

একটু এগিয়ে স্বামীজীদের বাসগৃহ ও অতিথিশালা। এখানে বাস করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হয়।

কলকাতা থেকে জয়রামবাটি আসার সহজ পথ তারকেশ্বর-আরামবাগ অথবা বিষ্ণুপুর হয়ে। তবে তারকেশ্বর হয়ে আসাই সবচেয়ে সহজ। তারকেশ্বর থেকে এখানকার দূরত্ব প্রায় তিরিশ মাইল। নিয়মিত বাস চলে। জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর তিন মাইল। তবে কামারপুকুর হুগলী জেলার অন্তর্গত।

জয়রামবাটি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতলপুর থানার অন্তর্গত। গ্রামখানি বড়ই সুন্দর। আদর্শ এর অবস্থান। গ্রামের

চারিপাশে শষ্যক্ষেত্র আর মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমোদর। ফলে মাটি বেশ উর্বর। ছোট ছোট কাঁচা-পাকা পথ বাসপথ থেকে বেরিয়ে গ্রামের ভেতর পড়েছে ছড়িয়ে—পথের পাশে অশ্বত্থ-আম-গুলঞ্চ, বট-বকুল-বেল গাছের সমাবেশ। নীরব গম্ভীর ও সুন্দর একখানি গ্রাম। বাঁকুড়ার বহু গ্রামের চেয়ে প্রাচুর্য পরিপূর্ণ। শোনা যায়—শ্রীমায়ের আবির্ভাবের আগে এ গ্রাম এমন সুন্দর ছিল না—এত ঐশ্বর্যশালী ছিল না। অন্নপূর্ণার আগমনে শক্তিপীঠ ধন-ধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক।

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে জয়রামবাটিকে শক্তিপীঠ রূপে অভিহিত করেছেন। কারণ—এই পুণ্যক্ষেত্র পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সরল শক্তির উৎস সারদামণিকে অঙ্কে ধারণ করেছে। একদিন শ্রীমা এই গ্রামের ধূলি মাথায় ধারণ করে, বলেছিলেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

এই গ্রামের নাম কেন জয়রামবাটি হলো, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে মুখোপাধ্যায়রা পুরুষানুক্রমে 'রাম' মন্ত্রের উপাসক। তাই সম্ভবত তাঁদের আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয়েছে জয়রামবাটি।

মন্দিরের সামনে তিনটি গোল স্তম্ভ। তিনদিকে খোলা বারান্দা। প্রত্যেক দিকেই কয়েকটি করে দরজা। বারান্দার যে কোন দিক থেকেই ভেতরে প্রবেশ করা যায়। সাদা রঙের মন্দির। মন্দিরের ছাদে সামনের দিকে নহবৎখানা আর মূল মন্দিরের ওপরে শ্বেত চূড়া ও 'মা' নামাঙ্কিত ধাতু-পতাকা।

বেলা চারটের সময় মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হলো। চার ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা সামনের বারান্দায় উঠে এলাম। বারান্দার পরেই বিশাল নাটমন্দির। মসৃণ পাথরের মেঝে ও দেওয়াল। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের ছবি। শান্ত সুন্দর ও সুগম্ভীর পরিবেশ।

নাটমন্দিরের শেষে মূল-মন্দির। শ্বেতপাথরের ঝকঝকে মেঝে।

একটু আগেই মায়ের ভোগ হয়ে গেছে। তারপরে মন্দির পরিষ্কার করে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাসে আমোদিত হচ্ছি আমরা।

শ্বেতপাথরের বেদীর ওপরে কালো কাঠের সিংহাসনে মা বসে আছেন। শ্বেতপাথরের পদ্মের ওপরে মায়ের মর্মরমূর্তি শান্তস্বভাবা চিন্তাশীলা নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা সারদামণি। পরনে লাল-পাড় গরদের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় হার। তাঁর ডান দিকে ধূতি পরানো ঠাকুরের ছবি আর বাঁ দিকে গেরুয়া পরানো স্বামীজীর ছবি। স্বামী ও সন্তানসহ জননী জগদ্ধাত্রী।

ধ্যান গম্ভীর পরিবেশ। সকলেই নীরবে দর্শন করছেন। কেউ কথা বলছেন না। পাছে মায়ের ধ্যান ভঙ্গ হয়। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে সকলেরই মাথা আপনা থেকে নত হয়ে এসেছে। সবাই সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করছে, আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে। মনে মনে, ভাবছে --ধন্য এই জয়রামবাটি, ধন্য এই ভারতভূমি আর ধন্য আমি, এই মহাতীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য হলো আজ।

“ ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’, সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সহ্যগুণের চেয়ে বড় গুণ নেই।…”

সহনশীল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একদিন বলেছিলেন ঠাকুরের এই বিচিত্র কথামৃত। বিচিত্র মানুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করতে পারেন নি, কিন্তু সংগীত ও কাব্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি শৈশব থেকেই দেবীমূর্তি তৈরি করে পুজো করতেন। তবু চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে রপ্ত করতে পারেন নি। গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনি ধর্মালোচনা করতেন, কিন্তু নিজে কখনও গেরুয়া পরেন নি। যে সব সন্ন্যাসী তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর ত্যাগ ও প্রেম, ভক্তি ও উপদেশ, স্বাধীনচিন্তা ও বৈরাগ্যের জন্য তাঁকে প্রাণের ঠাকুরের আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে ভারতভূমি, ধন্য হয়েছে বিশ্ববাসী। তাই আমরা আজ এসেছি এখানে। এসেছি পুণ্যভূমি কামারপুকুরে, যেখানে একশ একচল্লিশ বছর আগে জন্মেছিলেন ঊনবিংশ শতকের মানুষের ভগবান—‘যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ।’

যখন পাপের বোঝা পূর্ণ হয়, তখনই স্বয়ং ভগবান অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কালও তেমনি এক দুঃসময়। পাশ্চাত্য বেশভূষা আচার আচরণ ও ধর্মের মোহে ভারত তখন মোহগ্রস্ত। শিক্ষা সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। সেই সন্ধিক্ষণে সনাতন ধর্মরক্ষার জন্যে অনুকরণ প্রিয় ভারতবাসীকে মোহমুক্ত করতে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন এই শ্রীধাম কামারপুকুরে—গদাধর চট্টোপাধ্যায় রূপে।

ধন্য আমি, পরমহংসদেবের পরমপুণ্য জন্মভূমি দর্শনের সৌভাগ্য হলো আজ।

গদাধর জন্মেছিলেন ১৮৩৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। তাঁর ঠাকুর্দার নাম মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়, বাবা ক্ষুদিরাম ও মা চন্দ্রমণি দেবী। গদাধর ছিলেন চতুর্থ সন্তান ও ছোট ছেলে। তাঁরা তিন ভাই ও ছ'বোন।

কামারপুকুর ঠাকুরের বসতবাটি হলেও এটি তাঁর পূর্বপুরুষদের বাস্তু ভিটে নয়। ক্ষুদিরামের আদি নিবাস ছিল এখান থেকে মাইল দুয়েক পশ্চিমে দেরেপুর গ্রামে। তাঁর প্রায় দেড়শ' বিঘে জমি ছিল। দেরে-পুরের অত্যাচারী জমিদার রামানন্দ রায় একবার ক্ষুদিরামকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলে। সত্যাশ্রয়ী ক্ষুদিরাম সে আদেশ অমান্য করেন। রামানন্দ মিথ্যে মামলা সাজিয়ে ক্ষুদিরামের সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করে নেয়।

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ক্ষুদিরামের বন্ধু পরম ধার্মিক সুখলাল গোস্বামী তখন তাঁর নিজের বসতবাটির একদিকে কয়েকখানি খড়ের ঘর তৈরি করে ক্ষুদিরামকে এখানে নিয়ে আসেন। নিকটবর্তী লক্ষ্মীজলা গাঁয়ে বন্ধুকে এক বিঘা দশ ছটাক ধানের জমি দান করেন।

রামানন্দ ক্ষুদিরামের ক্ষতি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ক্ষতিতে কামারপুকুরের লাভ হয়েছে। সেদিন যদি ক্ষুদিরাম দেরেপুর থেকে বাস্তুচ্যুত না হতেন, তাহলে কামারপুকুর পুণ্যপীঠে পরিণত হতো না আজ আমরা এই শীতের সন্ধ্যায় এখানে এসে সমবেত হতাম না।

কামারপুকুর গ্রামটি সেকালে ছিল খুবই ছোট কিন্তু বড়ই সুন্দর— মন্দির শোভিত তপোবন সদৃশ। গ্রামের দুদিকেই ছিল মহাশ্মশান। সম্ভবত সেই শ্মশানই বালক গদাধরের মনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বীজ বপন করেছিল।

মাত্র তিন মাইল পথ। কাজেই জয়রামবাটি থেকে বাস ছেড়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা কামারপুকুরে পৌঁছেছি। বাস থেকে নেমেই রাস্তার বাঁদিকে গোপেশ্বরের মন্দির ও ডান দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ

ধাম। প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা সমৃদ্ধ একটি ছোট কিন্তু উঁচু দেবালয় —এই গোপেশ্বর মন্দির। সুখলাল গোস্বামীর পূর্বপুরুষ গোপীলাল গোস্বামী এই মন্দির নির্মাণ করেন। একবার ঠাকুরের দিব্য-উন্মাদ অবস্থাকে অনেকে উন্মাদ রোগ বলে ভুল করেন। উৎকণ্ঠিতা মাতা চন্দ্রমণি দেবী তখন এই মন্দিরে হত্যে দিয়ে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন— মুকুন্দপুরে শিবের কাছে হত্যে দাও মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

একজন পুরোহিত মন্দিরের সামনে বসে চরণামৃত ও আশীর্বাদ বিতরণ করছেন। কথায় কথায় তিনি আমাদের জানালেন—ঠাকুরের জন্মক্ষণে এই মন্দিরশীর্ষ থেকে একটা দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিক আলোকিত করেছিল। কাহিনীটি আমাদের যীশুখৃষ্টের জন্মক্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

গোপেশ্বর শিবমন্দির দেখে আমরা দল বেঁধে তোরণ পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। কয়েক পা এগিয়েই ডানদিকে পাথরের মন্দির। তার সামনেই নাটমন্দির। নাটমন্দিরের তিনদিকে তৃণাচ্ছাদিত ময়দান। অনেক নাটমন্দির দেখেছি কিন্তু এমন মনোরম ও আধুনিক নাটমন্দির আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। চারিদিকে কোন দেওয়াল নেই—সবটা জুড়ে লোহার ফ্রেমযুক্ত কাচের দরজা।

নাটমন্দিরের দক্ষিণে ময়দানের শেষে বাগান ও পুকুর। পশ্চিমে স্বামীজীদের বাসগৃহ ও মন্দিরের অফিস। সমস্ত এলাকাটাই উঁচু দেওয়ালে ঘেরা।

নাটমন্দিরের উত্তরে দক্ষিণমুখী মূল-মন্দির— শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। মন্দিরশীর্ষে সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ। ছোট পাথরের মন্দির কিন্তু বড়ই সুন্দর। তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে দরজা পেরিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি। শ্বেতপাথরের ঝকঝকে মেঝে। বাঁয়ে এবং ডাইনেও দুটি দরজা। পেছনে দেওয়াল ঘেঁষে দুটি স্তম্ভযুক্ত শ্বেতপাথরের বেদী। বেদীর গায়ে মাঝখানে একটি ঢেঁকি, উনোন ও প্রদীপ ক্ষোদিত—জন্মকালীন পরিবেশটির স্মারক। এখানে ক্ষুদিরামের ঢেঁকিশাল ছিল। আর

সেই ঢেঁকিশালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কাছেই ধানসিদ্ধ করার একটি উনোন। ধাত্রীর অসাবধানতায় নবজাত সেই উনোনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। হয়েছিলেন বিভূতিময়---ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

ঢেঁকির দু'পাশে বেদীর গায়ে দুটি চক্র ক্ষোদিত আছে। বেদীর ওপর শ্বেতপাথরের শতদলের মধ্যে পদ্মাসনে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ---পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি। পরনে ধুতি, গায়ে চাদর, গলায় উপবীত এবং রুদ্রাক্ষ ও ফুলের মালা। শান্ত সৌম্য ও সুমহান মূর্তি---যেন জীবন্ত। আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল।

১৯৫১ সালের ১১ই মে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢেঁকির দু'পাশে এবং মূর্তির দু'দিকে বেদীর ওপরে কয়েকটি ফুলদানী, পেছনে একখানি পরদা।

মন্দির দর্শন করে বাঁদিকের দরজা দিয়ে আমরা ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গণে এলাম। সামনেই শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির। পূর্বমুখী পাকা মন্দির। আগে এটি মাটির দেওয়াল ও মেঝেযুক্ত একটি খড়ের ঘর ছিল। এই মন্দিরে শিলারূপী রঘুবীর, ঘটরূপিণী শীতলা দেবী, রামেশ্বর শিব, গোপালদেব ও একখানি নারায়ণ শিলা আছে। রঘুবীর ঠাকুরের কুলদেবতা।

ক্ষুদিরাম একবার দূর গ্রাম থেকে ফেরার সময় ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সহসা তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে একটি জায়গা দেখিয়ে বলছেন---আমি বহুদিন ধরে অনাহারে ও অযত্নে এখানে পড়ে আছি। আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চলো। আমি তোমার সেবা পেতে চাই।

স্বপ্নের পরে ক্ষুদিরামের ঘুম গেল ভেঙে। তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় ছুটে গিয়ে দেখলেন, একটি সাপ একখণ্ড শিলার ওপরে ফণা তুলে আছে। ধার্মিক ক্ষুদিরাম 'জয় রঘুবীর' বলে শিলার কাছে এগিয়ে গেলেন। সাপটি অদৃশ্য হলো। পরম ভক্তিভরে ক্ষুদিরাম সেই সুলক্ষণযুক্ত রঘুবীরশিলা নিয়ে এসে তার গৃহদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন।

রঘুবীরশিলা পাবার আগেই ক্ষুদিরাম একটি ঘট প্রতিষ্ঠা করে শীতলা দেবীর পুজো করতেন। মা শীতলা ক্ষুদিরামকে দিব্যদর্শন দান করেছিলেন। ক্ষুদিরাম বলতেন—সকালে তিনি যখন ফুল তুলতে বেরুতেন তখন আট বছরের বালিকারূপে শীতলা দেবী তাঁর সঙ্গী হতেন ও তাঁকে ফুল তোলায় সাহায্য করতেন।

রঘুবীর মন্দিরের উত্তরে ঠাকুরের বৈঠকখানা। ঠাকুর এই ঘরে বসে বাইরের লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন ও ধর্মোপদেশ দিতেন। এ ঘরে তাঁর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র আছে।

বৈঠকখানার পুবে একখানি মাটির দোতলা ঘর। এখন এটি মন্দিরের ভাণ্ডার। সেকালে ঠাকুরের ভাইপো রামলাল এই ঘরে বাস করতেন।

ভাণ্ডারঘরের পুবে, জন্ম-মন্দিরের পেছনে একটি পুরনো আম্রগাছ আছে। ঠাকুর নিজে এই গাছটি লাগিয়েছিলেন। এটিতে এখনও আম হয়।

প্রাণভরে সব কিছু দেখে নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম বড় রাস্তায়। আজ ২৩শে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিন। স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যের জন্মদিনে, স্বামীজীর গুরুদেবের জন্মস্থান দর্শন করতে এসেছি। আমাদের চারখানি ছাড়া আরও দুখানি বাস এসেছে। এসেছে কয়েকটি ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ি। এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট বাস ডি-লুক্স। সত্যি লাক্‌জিউরিয়াস ব্যাপার। ট্যুরিস্ট বিভাগ মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে প্রতি রোববার ও ছুটির দিনে জয়রামবাটি-কামারপুকুর ভ্রমণের ব্যবস্থা করে থাকেন। সকাল দশটা নাগাদ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ থেকে বাস ছেড়ে রাত আটটায় ফিরে যায়। খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বাসে বসতে হয়। বিকেলে কামারপুকুরে চা ও জলখাবার মেলে। আমাদের দিতে হবে এক-তৃতীয়াংশ। অথচ আমরা সকালে চা ও বিস্কুট পেয়েছি, দুপুরে পেটভরে রুটি তরকারী কলা ও মিষ্টি খেয়েছি। সন্ধ্যায় আবার চা-বিস্কুট পাবো। তার

আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। সভাপতির সুপারভিশনে চায়ের জল গরম হচ্ছে। আমাদের বেসরকারী সংস্থা কিনা! আর সস্তা শব্দটির সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটা সুমধুর নয়।

দেশের লোক আরও বেশি ভ্রমণ করুক, বিদেশী পর্যটকরা আরও অধিক সংখ্যায় এ-দেশে আসুক এই উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে কেন্দ্রীয় ও প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারের আলাদা ট্যুরিস্ট বিভাগ। এদের কাজ পর্যটকদের সাহায্য করা খবরাখবর দেওয়া ও সস্তায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কার্যত দেখা যায় তাঁদের দেওয়া খবরাখবর প্রায়ই নির্ভুল নয় কারণ পথের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁরা তেমন ওয়াকিবহাল নন। আর তাঁরা যে-সব ভ্রমণের আয়োজন করে থাকেন, তা বেশ ব্যয়বহুল তথা সাধারণের সাধ্যের বাইরে।

আমরা ভাড়া করা বাসে চেপে পেট পুরে খেয়ে যে ভ্রমণ করছি, ওঁরা খাবার না দিয়ে নিজেদের বাসে চড়িয়ে সেই ভ্রমণের জন্যে তিনগুণ দক্ষিণা নিচ্ছেন। ট্যুরিস্ট বিভাগের স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁদের দপ্তর কোন উপার্জন-সংস্থা নয়, সেবা-প্রতিষ্ঠান। নইলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে জন-সাধারণের অর্থে এই দপ্তর গড়ে তোলা হয়েছে, তা ব্যর্থ হবে।

কামারপুকুরে ঠাকুরের স্মৃতিপূত কয়েকটি স্থান আছে। এই সব পুণ্যস্থানের মধ্যে প্রথমে বলতে হয় যোগীদের শিবমন্দিরের কথা। এই মন্দিরে ঠাকুরের মা চন্দ্রমণি দেবী দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন।

তার পরেই বলতে হয় হালদার পুকুরের কথা। এটি এখনও সুবৃহৎ জলাশয়। তবে সংস্কারের অভাবে জল খারাপ হয়ে গেছে। সে আমলে এর স্বচ্ছ সলিলে গ্রামের স্নান পান ও রন্ধনের কাজ হতো। ঠাকুর ও শ্রীমার জীবনের বহু স্মৃতি এই জলাশয়ের সঙ্গে জড়িত।

প্রথমে গোস্বামীরা এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরে লাহাবাবুরা তাঁদের জমিদারী কিনে নেন। ঠাকুরের জন্মস্থানের উত্তর দিকে বড় রাস্তার দক্ষিণে লাহাবাবুদের বসত-বাড়ি। কিন্তু এখন কেবল সেকালের

সেই সুবিশাল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট আছে। আছে দেবালয়, চণ্ডীমণ্ডপ ও পাঠশালা।

এই বাড়ি গদাধরের বাল্যলীলার বহু স্মৃতি বিজড়িত। এই বাড়ির ধর্মদাস লাহা ছিলেন ক্ষুদিরামের পরম-সুহৃদ। গদাধরের অন্নপ্রাশনের সময় তিনি ক্ষুদিরামকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী গদাধরকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি তাঁকে প্রকৃত গদাধর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলতেন। ধর্মদাসের পুত্র গয়াবিষ্ণু গদাধরের বাল্যবন্ধু ছিলেন। একবার লাহাবাড়ির শ্রাদ্ধবাসরে আহূত তর্ক-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতগণ ধর্মবিষয়ক কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। দশ বছরের বালক গদাধর সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করে দেন।

লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই নাট-মন্দিরটা—বিরাট একখানি চৌ-চালা। চারদিকে খোলা। এখন অসংখ্য পাখির বাসা। কিন্তু সেকালে এখানেই বসত পাঠশালা। শিশু গদাধর পাঁচ বছর বয়সে পুঁথি নিয়ে এখানে পড়তে আসতেন। কিছু-দিনের মধ্যেই তিনি লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। তাঁর হাতের লেখা খুবই সুন্দর ছিল। পরবর্তীকালে তিনি 'সুবাহু' ও 'যোগাদ্যার পালা' প্রভৃতি নাটকের যে অনুলিপি করেছিলেন, তা এখনও বেলুড়মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

কিন্তু গদাধর বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেন নি। তিনি পাঠশালায় বসে দেব-দেবীর চিন্তায় বিভোর হয়ে মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। মা ভাবতেন মৃগীরোগের লক্ষণ। তাই তিনি তাঁকে মাঝে মাঝেই পাঠশালায় যেতে দিতেন না।

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যনিকেতন। এ গ্রামের আকাশে ঠাকুরের পুণ্যময় পরশ, বাতাসে তাঁর মধুর স্মৃতি আর মাটিতে মিশে আছে তাঁর চরণরেণু। সারা কামারপুকুরই ঠাকুরের মহিমা কীর্তন

করছে। তবু কয়েকটি পুণ্যক্ষেত্র বিশেষ করে তাঁর বাল্যলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর কয়েকটি আমরা এতক্ষণ ধরে প্রদক্ষিণ করলাম। ঠাকুরের স্মৃতিপূত আরও ক'টি পুণ্যস্থান আছে কামারপুকুরে—সীতানাথ পাইনের বাড়ি, ধনী কামারনীর বাস্তুভিটে ও মন্দির, চিনু শাঁখারীর বাস্তুভিটে, বুধুই মোড়লের শ্মশান, পান্থনিবাস (চটি), মুকুন্দপুরের শিবমন্দির ও মানিক রাজার আমবাগান। এই সব স্থান দর্শন করতে হলে অন্তত একটা রাত এখানে কাটাতে হবে। রাত্রিবাসের কোন অসুবিধে নেই কামারপুকুরে। রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথিশালা ও জিলা পরিষদের ডাকবাংলো আছে। অবশ্য আগের থেকে চিঠি লিখে বাস করার অনুমতি নিতে হয়।

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। সাতটা বাজে। তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে পা চালাই। ছোট বাজার—কয়েকটি মুদি মনোহারী ও মিষ্টির দোকান। ফিরে আসি বাসের কাছে। ইতিমধ্যে চা হয়ে গেছে। আমরা এসে ভিড় জমাই সেখানে।

চা পর্ব শেষ করে সবাই সুবোধ বালকের মতো বাসে উঠে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ি। ড্রাইভার কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে বাস দিলেন ছেড়ে।

ঘন আঁধার নেমে এসেছে মাটিতে। সেদিনও এমনি আঁধারে ছেয়ে ছিল। অধর্ম আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল ভারতভূমি। ধর্ম ও জ্ঞানের আলো নিয়ে জন্মেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই আলোয় আঁধার ঘুচে গিয়েছিল। পথের সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—মুক্তির পথ। মুক্তিপথ-সন্ধানী বিবেকানন্দ সেই আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন বিশ্ব-জগৎ।

নিজেদের অযোগ্যতায় আমরা সেই দীপশিখাটি ফেলেছি হারিয়ে। তাই আবার আঁধার ঘনীভূত হয়েছে এই হতভাগ্য দেশের মাটিতে। ধর্ম বিদায় নিয়েছে ভারতভূমি থেকে। অজ্ঞানতায় ছেয়ে গেছে মানুষের মন। কিন্তু নতুন রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের শঙ্খধ্বনি তো শুনতে পাচ্ছি

না! তা হলে কি আমরা আলোহীন হয়ে চিরকালের মতো অন্ধকারে হারিয়ে যাব?

না। 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

তিনি আসবেন। পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁকে আসতেই হবে।

ভাবীকালের সেই নতুন রামকৃষ্ণকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম কামারপুকুর থেকে বিদায় নিই।

'সাবধান, চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

দেওয়ালের লিখন। বাড়ির নয়, গাড়ির --রেল গাড়ির। নজর পড়তেই চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি বেঞ্চির নিচে পা ঢুকিয়ে একবার থলিটাকে স্পর্শ করি। না, যাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ঐ হুঁশিয়ারী, তারা এখনও কৃপা করে নি। তবে দেওয়ালের লিখন আমাকে সজাগ করে দিয়েছে। সজাগ থাকা একান্তই প্রয়োজন। নইলে নামবার সময় দেখবেন আপনার থলি কিংবা সুটকেসটি অদৃশ্য হয়েছে। অপহৃত ঐশ্বর্য উদ্ধারের আশায় আপনাকে তখন চাকরিপ্রার্থী বেকারের ন্যায় এক দুয়ার থেকে আর এক দুয়ারে ধর্ণা দিতে হবে। তাঁরা জেরা করবেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

—আজ্ঞে, হাওড়া থেকে।

কোথায় যাচ্ছেন ?

—আপাতত ধানবাদ।

-- সুটকেসটা কোথায় রেখেছিলেন ?

—বাঙ্কের ওপরে।

—শেষবার কখন দেখেছেন ?

—আসানসোলে।

—গাড়ি ছাড়ার আগে কি পরে ?

—আগে।

—তাহলে তো আসানসোলেও চুরি হতে পারে ?

—তা পারে।

— তাহলে এ চুরি আমার জুরিসডিক্‌শানে নয়। আপনাকে আসান-সোলে ফিরে গিয়ে, সেখানকার জি. আর. পি.-তে ডায়েরী করতে হবে।

আর যদিও বা সাব্যস্ত হয় যে তাঁর জুরিসডিক্শানের মধ্যেই মাল উধাও হয়েছে, তাহলেও আপনার রেহাই নেই। সে-রাত সেই প্ল্যাটফর্মে মশার সঙ্গে সহাবস্থান করে, পরদিন সকালে কোতোয়ালীতে হাজিরা দিতে হবে। সেখানকার লাগেজ-লিপ্টারদের এ্যালবাম থেকে আপনাকে সেই স্যুটকেস অপহরণকারীর ছবি বেছে দিতে হবে। অর্থাৎ আপনার সহযাত্রীদের মধ্যে কারও চেহারার সঙ্গে সেই এ্যালবামের কোন ছবির সাদৃশ্য আছে কিনা। যদি ধরুন আন্দাজে খান দুয়েক ছবি বেছে দিতে পারলেন, তখন কর্তৃপক্ষ সেই ব্যক্তিদের পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করবেন। তাঁরা যদি পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করে হাজির হন এবং আপনার নির্বাচন নির্ভুল হয়ে থাকে, তাহলেই অপহৃত ঐশ্বর্য উদ্ধারের যৎকিঞ্চিৎ আশা আছে, নইলে 'কা কস্য পরিবেদনা'।

কাজেই এত গোলমালে আমার কি দরকার? তার চেয়ে দেওয়ালের লিখনের নির্দেশ অনুযায়ী মালের ওপর নজর রেখে ধানবাদ পৌছনোই ভাল।

হাওড়া থেকে গাড়ি ছেড়েছে রাত সাড়ে আটটায়—আমার সেই পরম-প্রিয় গাড়ি—দুন এক্সপ্রেস। কিন্তু হিমালয়ের হাতছানিতে এবারে ঘর ছাড়ি নি। তাই এবার গন্তব্যস্থল দেবতাত্মা হিমালয়ের কোন ধ্যানগম্ভীর গিরিতীর্থ কিংবা কোন সুদুর্গম তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ নয়। নেহাতই নির্ঝঞ্ঝাটের এই পরিক্রমা। স্বল্প অবসরে সীমিত ব্যয়ে বিহারের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ। আরামের এবং আনন্দের ভ্রমণ। এক্সপিডিশান বা ট্রেকিং তো নয়ই, এমন কি হাইকিং পর্যন্ত নয়—নির্ভেজাল সাইট সিয়িং। যন্ত্রযানের সওয়ার হয়ে কয়েকটা দিন একটু হাওয়া খেয়ে আসা। দিন সাতেকের ছুটি আর শ'দুয়েক টাকা সম্বল করে এই পরিক্রমা। আপাতত লক্ষ্যস্থল তোপচাঁচি। পথে ফাউ জুটবে ঝরিয়া ও সিন্দ্রি।

মানব সভ্যতার আদি প্রভাত থেকেই বিহারে সভ্যতার আলো এসে পৌছেছিল। মহাকাল তার সকল চিহ্নকে একেবারে মুছে ফেলতে

পারে নি। এখনও কিছু কিছু সাক্ষী রয়ে গেছে। আছে—গয়া, নালন্দা, রাজগীর, পাটলিপুত্র, বৈশালী, মিথিলা, পাওয়াপুরী, পরেশনাথ, সাসারাম ও মানের। আছে বহু স্বাস্থ্যকর রমণীয় স্থান তোপচাঁচি, গিরিডি, মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা, রাঁচি, নেতারহাট ও হাজারীবাগ। আছে—কাব্যময় সাঁওতাল পরগণা আর স্বপ্নময় পালামৌ।

খুব বেশি দিনের কথা নয়। তিরিশ বছর আগেও দেখেছি, পশ্চিম বলতে এই সব জায়গাই বোঝাত। সকলেই মহানন্দে 'পশ্চিমে' ছুটি কাটিয়ে ওজন বাড়িয়ে ঘরে ফিরতেন। এখন রেওয়াজ পালটে গেছে। অন্তত হাজার খানেক মাইল রেলে না চাপলে আজকাল আর বেড়ানো হয় না। কিন্তু সবার সে সামর্থ্য ও সুযোগ হয়ে ওঠে না। ফলে তাদের ঘরেই বন্দী হয়ে থাকতে হয়। অথচ আমাদের ঘরের কাছেই কত দর্শনীয় স্থান আছে। এই উদ্দেশ্যেই এবারে আমার ঘর ছাড়া।

রাত ছুটো বেজে তিন মিনিটে গাড়ি ধানবাদ পৌঁছবার কথা। হাওড়া থেকে ধানবাদ ২৭১ কিলোমিটার বা ১৬৯ মাইল। ধানবাদ থেকে তোপচাঁচি ২৩ মাইল। নিয়মিত বাস চলে, তোপচাঁচি গোমো থেকে মাত্র চার মাইল। কিন্তু আমি ঝরিয়া ও সিন্দ্রি দেখে যাব বলে ধানবাদে নামছি।

আমার সহযাত্রী মেসার্স শীল এ্যাণ্ড কোম্পানীও তোপচাঁচি চলেছেন। অভিযানে যাচ্ছেন বলাই ভাল। স্ত্রী, ছুটি ছেলে, একটি মেয়ে ও ছোকরা চাকর রামুয়াকে নিয়ে মিস্টার শীলের কোম্পানী। মিস্টার শীলের চাকর একটি কিন্তু রামুয়ার মালিক পাঁচজন। অর্থাৎ পরিবারস্থ সকলেই গাড়ি ছাড়ার পর থেকে পালা করে হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাই তালিম দিতে গিয়ে বেচারা রামুয়ার প্রাণান্ত।

মালপত্রের বহর দেখে শীল এ্যাণ্ড কোম্পানীর জনসংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, নিদেনপক্ষে ডজন খানেক লোক মাসাধিককালের জন্য কোন হিমশীতল পুরীতে প্রবাসী হচ্ছেন। থার্মোজার, থার্মোফ্ল্যাস্ক, টিফিন কেরিয়ার, ক্যামেরা, বায়নোকুলার,

ট্রানজিস্টার, টেপরেকর্ডার, ফলের ঝুড়ি, বাসনের ঝুড়ি, স্টোভ, সুটকেস, ট্রাংক ও এয়ারওয়েজের ব্যাগ ইত্যাদি অসংখ্য সাজ-সরঞ্জাম। গাড়ি ছাড়ার পর থেকেই দফায় দফায় খাওয়া চলেছে। তবে মিস্টার মানুষটি মন্দ নয়, বেশ দিলদরিয়া। সেধেই আলাপ করেছেন। আমিও তোপচাঁচি যাব শুনে খুশি হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে নির্দেশ দিয়েছেন "এই খুকু তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিস, ভদ্রলোককে দুটো মিষ্টি দে না।"

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি তার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে গোটা দুই মিষ্টি একটা প্লেটে করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। ভদ্রতার প্রয়োজনে আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ফোঁস করে উঠেছেন, "এই তো তোমাদের দোষ, আজকালকার ছেলেদের···"

মিসেস শেষ করার আগেই মিষ্টি দুটি হাতে তুলে নিয়েছি। মেয়েটি মুচকি হেসে প্লেটটি সরিয়ে নিয়েছে।

"ভালই হল। আপনাকে সঙ্গে পাওয়া গেল।" মিস্টার খুশিমনে শুরু করেন।

"আজ্ঞে, আমি তোপচাঁচি যাচ্ছি বটে, তবে আপনাদের সঙ্গে গোমো পর্যন্ত যাব না।"

"কেন?" মিস্টার শীল সবিশেষ বিস্মিত।

"আমি ধানবাদে নামব ভেবেছি।"

"ও ভাবনা ছেড়ে দিন মশাই। ওতে অনেক ঝামেলা। একে তো বাকি রাত স্টেশনে বসে মশার কামড় খাবেন, তার ওপর সকালে সেই বাসের হাঙ্গামা। তার চেয়ে চলুন গোমোতে নেমে একটা ট্যাক্সি করে চলে যাই তোপচাঁচি।"

মনে মনে ভাবি—যা লটবহর এনেছেন, তাতে ট্যাক্সি নয় ট্রাক লাগবে। মুখে বলি, "যাবার পথে ঝরিয়া ও সিন্দ্রি দেখে যাব ঠিক করেছি।"

মিস্টার নিরুত্তর। মিসেস প্রশ্ন ছাড়েন, "তুমি বুঝি ট্যুরিস্ট?"

গাড়ির গতি কমে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকাই—দুটো বেজেছে আমার রেলযাত্রার যতি আসন্ন—ধানবাদ এসে গেছে। বেঞ্চির তলা থেকে থলিটা বের করে পিঠে বেঁধে নিই। থলিটা একটু বিচিত্র ধরনের —একটি ফ্রেমহীন রুক্‌স্যাক্‌। পদযাত্রার যাবতীয় জিনিস ভেতরে পুরে পিঠে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায়। মিসেস তাঁর সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ হলেন। মিস্টারকে ইশারা করেন। গাড়ি থেমে যায়। আমি ওদের বিদায় জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি।

ধানবাদে গাড়ি থেকে নামলেন কয়েকজন। স্টেশনও জনহীন নয়। রিকশাওয়ালারা বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার জীবনযাত্রা রেলের সঙ্গে জড়িত। রাত যতই গভীর হোক, ধানবাদ ঘুমিয়ে পড়ে নি। সে জেগেছিল দুন এক্সপ্রেসের প্রতীক্ষায়। আমি বাকি রাতটুকু স্টেশনেই কাটাবো। ওয়েটিং হলের এক কোণে এসে থলিটা পিঠ থেকে নামাই। থলি খুলে এয়ার ম্যাট্রেস ও চাদর বের করে শুয়ে পড়ি।

কম করেও ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। শয্যা গুটিয়ে বাথরুমে আসি। মুখ ধুয়ে আরাম করে স্নান সেরে নিই। তারপর থলিটি লেফ্‌ট-লাগেজে রেখে, রেলের রেস্তোরাঁ থেকে চা খেয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে।

ঝরিয়ার বাসে উঠে বসা গেল। সাড়ে ছটায় বাস ছাড়ে। ঝরিয়া ধানবাদ থেকে সাড়ে চার মাইল। ধানবাদ এখন জেলা শহর—নগরে রূপান্তরিত। রেলকে কেন্দ্র করে একদা গড়ে উঠেছিল এই জনপদ। ধানবাদের চারিদিকে কয়লা খনি—ঝরিয়া, কাতরাস,নওয়াগড়। এই সুবিস্তীর্ণ খনি-অঞ্চলের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের আমদানী ও উৎপাদনের রপ্তানী ধানবাদ মারফতই হয়ে থাকে। ধানবাদে একটি মাইনিং কলেজ আছে। ভারতের বাইরে থেকে পর্যন্ত ছেলেরা এখানে পড়তে আসে। ধানবাদ বর্তমান বিহারের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। তবে ধানবাদ কিন্তু কিছুকাল আগেও বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত

বাঁকুড়ার জেলা জজই ধানবাদ তথা মানভূমের বিচারকর্তা ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শাস্তিস্বরূপ লর্ড কার্জন বিহারকে মানভূম উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের প্রতিশ্রুতি পালিত হলে আজ ধানবাদ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হত। বর্তমান বিহারের স্রষ্টা ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ১৯১২ সালে বলেছিলেন, 'The whole district of Manbhum and pargana of Dhalbhum are Bengali speaking and they should go to Bengal.' কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি। যাঁরা দেশকে ভাগ করেছিলেন, তাঁরাই মানভূমকে ভাগ করলেন। ধানবাদ বিহারের ভাগে পড়ল—তৃতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হল।

শাসন-ব্যবস্থা যাই হোক, সরকারী ভাষা যাই হয়ে থাক, জনগণের ভাষা কিন্তু এখনও বাংলা। শুধু ধানবাদ শহরে নয়, ঝরিয়া, সিন্ড্রি ও তোপচাঁচিসহ সারা ধানবাদ জেলায়। কাজেই নির্ভয়ে আপনারা আমাকে অনুসরণ করতে পারেন। রাষ্ট্রভাষা না জানার জন্য আপনাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না।

ঝরিয়া একটি সুপ্রাচীন শহর। অসংখ্য ঝক্‌ঝকে দোকান। জনবহুল বাজার ও আধুনিক হোটেল আছে। কয়লার খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শহর। কয়লাই ঝরিয়ার জীবন।

বাস থেকে নেমে ট্যাক্সি করে শহরের উপকণ্ঠে একটি কয়লাখনিতে এলাম। আমার এক বন্ধু এই কোলিয়ারীর ম্যানেজার। কলকাতা থেকেই তাকে চিঠি লিখেছিলাম। সে আমার খনি দর্শনের সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে। ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার অন্তরলোকে আধুনিক সভ্যতার ধারক কালো-হীরার সেই রহস্যময় জগৎ দর্শন করে আবার ফিরে এলাম মাটির পৃথিবীতে।

ফিরে এলাম ঝরিয়ায়। চেপে বসলাম সিন্ড্রির বাসে। সিন্ড্রি

ঝরিয়া থেকে আট মাইল। নিয়মিত বাস চলে। সিন্দ্রি গড়ে উঠেছে সার কারখানাকে কেন্দ্র করে। কিছুকাল আগে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও স্থাপিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে যে বিরাট উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয়েছে, সিন্দ্রি তার একটি উল্লেখযোগ্য হোমশিখা।

এশিয়ার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও আধুনিক সার উৎপাদন কেন্দ্র সিন্দি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অন্নাভাব আমাদের নিত্যসঙ্গী। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সিন্দ্রি উৎসর্গীকৃত।

অনুমতি ছাড়া কারখানার ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। আমি আগেই পত্রযোগে অনুমতি সংগ্রহ করেছি। কারখানা দর্শন করে ধানবাদ ফিরে এলাম বেলা একটায়।

বেলা দুটোয় বাস ছাড়ল—ধানবাদ থেকে ইস্‌রি বা পরেশনাথ রেল-স্টেশন। পথে পড়বে তোপচাঁচি। ধানবাদ থেকে সোজা পথে বাইশ মাইল। আমাদের বাস গোবিন্দপুর হয়ে যাবে। এ পথে দূরত্ব একটু বেশি।

ছ' মাইল এসে গোবিন্দপুর—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগস্থল। অতি প্রাচীন গ্রাম। সেকালের তীর্থযাত্রীদের একটি প্রধান চটি। বাংলা ভাষায় প্রথম ভ্রমণকাহিনী যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণ'-এ গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে। লেখক ১৮৫৩ সালের মার্চ মাসে তীর্থ-দর্শনে বেরিয়ে গোবিন্দপুরে এক রাত কাটিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'এই চটি অবধি মগধ রাজ্য (মৎস্যদেশ) বরাকরাবধি বিরাট রাজ্য, তাহার পর জরাসন্ধাধিকার মগধ। এই স্থানের মনুষ্যগণ দোভাষী, আধা খোট্টা আধা বাঙ্গলা বোলি। বৃহৎ চটি, অর্ধ ক্রোশের অধিক চটি, খোলার বৃহৎ বৃহৎ ঘর সকল, এক এক ঘরে ত্রিশ-বত্রিশজন পথিক থাকিতে পারে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল, উত্তম শ্রেণীমতে দোকান সকল আছে।'

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভারতের প্রাচীনতম পথ। প্রায় চারশ' বছর

ধরে এই পথ বাংলা ও উত্তর ভারতের যোগসূত্র। এই পথ দিয়ে সোনার গাঁ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সৈন্য চলাচল করেছে, আমদানি রপ্তানী হয়েছে, আবার তীর্থযাত্রাও চলেছে। শের শাহ এই পথের দু'ধারে বৃক্ষরোপণ ও প্রতি চার মাইল অন্তর এক একটি সরাইখানা নির্মাণ করে দেন। যতুনাথ সর্বাধিকারীর আমলেও বহু সরাইখানা বা চটি অবশিষ্ট ছিল। তখন গোবিন্দপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে ছিল তোপচাঁচি চটি বেশ জমজমাট। নবাবী আমলে এখানে একটি সেনানিবাস ছিল। সৈন্যরা এখানে তোপচালনা শিক্ষা করতেন বলে জায়গাটার নাম হয়েছিল তোপচাঁচি। যতুনাথ সর্বাধিকারীর আমলে সেনানিবাস ছিল না কিন্তু নামটা বেচে ছিল চটির নামের মধ্যে। এই চটির নামেই পরে হ্রদের নাম হয়েছে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে ১৯১ মাইল স্টোনের সামনে বাস আমাকে নামিয়ে দিল। এখান থেকে হ্রদ প্রায় এক মাইল। এই পথটুকু হাঁটতে হবে। থলিটা পিঠে বেঁধে নিয়ে চলা শুরু করি। ভারী সুন্দর পথ—ছায়া সুনিবিড় মসৃণ পথ। তবে একা এ পথে না আসাই ভাল। দু' দিকেই গভীর জঙ্গল। এসব অঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে বাঘের উৎপাত হয়। সেকালে তো এটা বাঘের খাসমহলই ছিল। তাই সাহেবরা জঙ্গলের বাইরে, হ্রদ থেকে দু' মাইল দূরে পি. ডাবলু. ডি-র ইন্সপেকশান বাংলো তৈরি করেছেন। ধানবাদের পি. ডবলু. ডি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি নিয়ে সেখানে বাস করা যায়। জনপ্রতি দৈনিক ভাড়া তিন টাকা, বিজলী খরচ আলাদা। জায়গাটা যতই নিরাপদ হোক, আমি কিন্তু সেখানে উঠব না। আমি চলেছি লেক হাউসে। ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ড কর্তৃক নির্মিত হ্রদের নিকটে অবস্থিত বিশ্রামগৃহ। বোর্ডের ধানবাদ অফিস থেকে সেক্রেটারীর অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছি। দৈনিক ঘরভাড়া আট টাকা, অতিরিক্ত যাত্রীদের জন্য জনপ্রতি দু' টাকা ও বিজলীখরচ এক থেকে দু' টাকা। ফ্রিজিডিয়ার ব্যবহার করলে জনপ্রতি দৈনিক আরও পঞ্চাশ পয়সা

দিতে হয়। বাসনপত্র এবং মজুরী দিলে পাচকও পাওয়া যায়—তারা দেশী-বিদেশী দু'রকম রান্নাই রাঁধতে পারে।

চৌকিদারকে অনুমতিপত্র দেখাতেই ঘর পেয়ে গেলাম। হাত পা ধুয়ে জামা-কাপড় পালটে নিলাম। চৌকিদার চা ও বিস্কুট নিয়ে এল। তাকে শীল অ্যাণ্ড কোম্পানীর কথা জিজ্ঞেস করি। সে সোৎসাহে জানায়, "হাঁ, হা, তাঁদের সকালে আসার কথা ছিল। আমি কালই ঘর পরিষ্কার করে রেখেছি। কিন্তু এখনও তো এসে পৌঁছলেন না।"

চিন্তার কথা। গোমো থেকে তোপচাঁচি মোটে চার মাইল। রাত দুটো আটচল্লিশ মিনিটে দুন এক্সপ্রেস গোমোতে পৌঁছয়। এতক্ষণে তাঁরা এলেন না কেন? তাহলে কি কোন বিপদ ··? কি বিপদ হতে পারে? এ্যাক্‌সিডেণ্ট? কিন্তু ধানবাদ স্টেশনে তো কিছু শুনলাম না। তবে কি গোমো থেকে এখানে আসার পথে কিছু···?

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে আসি বাংলোর বাইরে। এগিয়ে চলি বাঁধের দিকে। গেট পেরিয়েই বাঁধ শুরু। তিনদিকে সবুজ পাহাড়, একদিকে ৯০০ ফুট দীর্ঘ ও ৭৮ ফুট উঁচু বাঁধ। বাঁধের উপর দিয়ে পথ। সেই পথ প্রসারিত হয়েছে তিনদিকের পাহাড়ের গায়ে—সমস্ত হ্রদটিকে বেষ্টন করেছে। এই পথে গাড়ি চালাতে হলে দক্ষিণা প্রদান করে অনুমতিপত্র গ্রহণ করতে হয়। মৎস্য শিকার এবং নৌবিহারের জন্যও একই ব্যবস্থা।

প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে চিরশান্ত চিরস্থির চিরমৌন সুবিশাল জলাশয় তোপচাঁচি হ্রদ। ১৯১৫ সালে শুরু হয়ে ১৯২৫ সালে এই বাঁধের কাজ শেষ হয়। একটি পাহাড়ী নদীকে বেঁধে রাজদহ উপত্যকায় এই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি কবা হয়েছে। ঝরিয়া কাতরাস ও নওয়াগড়ের বিস্তীর্ণ খনি-অঞ্চলের জলাধার -জনগণের জীবন এই তোপচাঁচি।

বৈকালী রোদ বিদায় নিয়েছে হ্রদের বুক থেকে, পরেশনাথ পাহাড়ের

শিরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে—তার কালো মুখখানিকে আলো করেছে। ছায়া পড়েছে নিথর নিস্তব্ধ নিরুদ্বিগ্ন তোপচাঁচির জলে।

দিনের আলো মিলিয়ে আসছে, সন্ধ্যার আঁধার নামছে। আকাশের রং বদলাচ্ছে, মাটির রং পালটাচ্ছে, জলের রং পরিবর্তিত হচ্ছে।

পরেশনাথ পাহাড়ের ছায়া কালো থেকে কৃষ্ণকালো হল। আকাশ মাটি ও জলের সব ব্যবধান গেল মুছে। ওরা এক হয়ে গেল।

কিন্তু এই মিলন-মুখর গোধূলির সাক্ষী হবার আমার অবকাশ কোথায়? আমি পথিক—সকল কালের, সকল পথের পথিক। পাখির কূজন কিংবা পাহাড়ের মিলন আমাকে আনমনা করতে পারে না। আমি তাই চরণরেখা এঁকে এগিয়ে চলি দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জীবন থেকে মহাজীবনের পথে।

'বিড়ি পিনা মানা হ্যায়।'

দেওয়ালের লিখন। রেলগাড়ির নয় মোটর গাড়ির—বাসের। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সিগারেট বা চুরোটে আপত্তি নেই কিন্তু আসলে 'বিড়ি পিনা' শব্দ দুটি ধূমপান তথা smoking-এর রাষ্ট্রীয়রূপ।

রাষ্ট্রীয় পরিবহনেরই যাত্রী আমরা। তোপচাঁচিতে দুপুরের খাওয়া সেরে যাত্রা করেছি পরেশনাথ পাহাড়ে। ধানবাদ থেকে পরেশনাথ পাহাড় ৫০ মাইল, তোপচাঁচি থেকে ২৮। হাজারিবাগ ও গিরিডি থেকে যথাক্রমে ৫০ ও ১৯ মাইল। পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে নিমিয়া-ঘাট ও উত্তর পাদদেশে মধুবন। মধুবন থেকেই পাহাড়ে ওঠা ভাল। কারণ সেখানে জৈনদের বিরাট বিরাট ধর্মশালা রয়েছে। রাত্রিবাসের আশ্রয় পাওয়া যাবে। আমরা তাই তোপচাঁচি থেকে বাসে ইস্‌রি এসে মধুবনের বাস ধরেছি।

জায়গাটার নাম ইস্‌রি কিন্তু রেল স্টেশনের নাম পরেশনাথ। পরেশনাথ রেল স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে কিংবা মোটরে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। পরেশনাথ রেল স্টেশন থেকে পাহাড়ের ওপর পরেশনাথের মন্দির দেখা যায়। আগে এদিক থেকে পাহাড়ে ওঠার কোন পথ ছিল না। সবাইকে মধুবন দিয়ে উঠতে হত পাহাড়ে। এখন দু-দিক দিয়েই যাত্রীরা যাতায়াত করেন। কলকাতা থেকে পরেশনাথ রেল স্টেশন ১৯৮ মাইল।

ইস্‌রি থেকে দু' মাইল এসে ডুমরি—চৌরাস্তার মোড়, বাসের বড় জংশন। মূল-রাস্তাটা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—তোপচাঁচি থেকে এসে গয়ার দিকে চলে গেছে। একটি গেছে বেরমো-বোকারো হয়ে গোমিয়া,

আরেকটি গিরিডি—ডুমরি গিরিডি রোড। এই পথেই আমাদের বাস ছুটে চলেছে।

পিচ-ঢালা মসৃণ পথ। দু' দিকেই শালবন—কোডারমা রিজার্ভ ফরেস্ট। একশ' বছর আগে মধুবন যেতে এত ঘুরতে হত না। তোপ-চাঁচি থেকে মধুবনের দূরত্ব ছিল মোটে চার মাইল। ১৮৫৩ সালে যদুনাথ সর্বাধিকারী তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পরেশনাথের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তোপচাঁচির চটি অবধি পাহাড়ের ঘাট চড়াই উৎরাই জরাসন্ধের গড়, এই স্থানে পরেশনাথের পাহাড়, এ পথে এ পাহাড়ের তুল্য উচ্চ পাহাড় নাই। তিন ক্রোশ উর্ধ্বে উঠিতে হয়। পর্বত, ফল-ফুলের লতা বৃক্ষে সুশোভিত, বনমধ্যে হিংস্র জন্তুগণ আছে, পর্বতের শৃঙ্গে পরেশনাথের মন্দির আছে, তাহাতে এক মূর্তি প্রস্তর-নির্মিত বিবস্ত্র, সরাবগি (জৈন শ্রাবক) বণিক্‌দিগের কুলদেবতা। একজন মোহন্ত স্বরূপ, জটাধারী, ভস্মমাখা, তথায় আছেন, তাঁহার চেলা সকল সরাবগির বণিক। ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে ঐ পর্বতের নিম্নে যে মধুবন আছে, সেই স্থানে পরেশনাথের মেলা হয়। মধুবনের মধ্যে ৭ খানা দোকান আছে, তথায় অবস্থিতি করিবার স্থান, পর্বতের উপরে পুষ্করিণী এবং পুষ্পোদ্যান আছে। মধুবনে আগরওয়ালা বেনেদিগের ধর্মশালা আছে। তোপচাঁচির পশ্চিম ২ ক্রোশ মধুবন।'

পরেশনাথ পাহাড়ের দক্ষিণে তোপচাঁচি, উত্তরে মধুবন। সেকালে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ ছিল। যাত্রীরা এই পথেই পরেশনাথ দর্শনে আসতেন। যদুনাথ সর্বাধিকারী পরেশনাথ পাহাড়কে জরাসন্ধে গড় বলেছেন কারণ এই পাহাড়ই ছিল মগধরাজ জরাসন্ধের রাজ্যের পূর্ব-সীমা। তিনি পরেশনাথে প্রাচীন জৈনকীর্তির বহু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন। শুনেছি এখনও তার কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। সেকালেও স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে পরেশনাথ বিখ্যাত ছিল।

বেলা প্রায় চারটের সময় আমাদের বাস মধুবন পৌছল। পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় সমতল প্রান্তর। দেখে মনে হয় বন কেটে বসত

হয়েছে। মাইল দুয়েক আগেও আমরা ঘন শালবন দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কিন্তু চারিদিকে ক্ষেত-খামার, বাড়ি-ঘর ও ধর্মশালা - প্রাসাদ বলাই বোধহয় উচিত হবে। একটি নয়, পাশাপাশি তিনটি ধর্মশালা—শ্বেতাম্বর, দিগম্বর ও তেরোপন্থী সম্প্রদায়ের ধর্মশালা। তুলনায় শ্বেতাম্বর ধর্মশালাটি বৃহত্তম। কিছুদিন আগেও পরেশনাথ পাহাড় ওদের সম্পত্তি ছিল। ১৯১৮ সালে পালগঞ্জের মহারাজার কাছ থেকে তাঁরা এই পাহাড়টি ক্রয় করেন। এখন কিন্তু পাহাড়টি বিহার সরকারের সম্পত্তি। এ ব্যাপারে বিহার সরকার ও শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীআনন্দজী কল্যাণজীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল বিহার সরকার এই পাহাড় খাস দখল করেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে পাহাড়টির প্রায় চার হাজার একর বনভূমি বিহার সরকারের হাতে এসেছে। সরকার এজন্য মন্দিরের ট্রাস্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়েছেন এবং জৈনদের ধর্মীয় অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত করেছেন। পরেশনাথ পাহাড়ের বনাঞ্চলের উন্নতি বিধানের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বনবিভাগ এই এলাকায় চন্দন বৃক্ষের সংরক্ষণ ও প্রসারের ব্যবস্থা করছেন। অদূর ভবিষ্যতে পরেশনাথ হয়তো মহীশূরের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে উঠবে।

এই সরকারী দখল নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বাদ-বিতণ্ডা হয়ে গেছে। খাস দখল করার অনতিকাল পরেই শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। সরকার তখন তাঁদের হাতেই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেড়ে দিতে সম্মত হন। সঙ্গে সঙ্গে দিগম্বর সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতার দিগম্বর জৈন বড় মন্দিরে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেড় শতাধিক নারী পুরুষ অনশন করেন। তাঁদের দাবি—পরেশনাথ পাহাড় সমস্ত জৈন সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থ, কাজেই এই পাহাড়ের কর্তৃত্ব যৌথভাবে

উভয় সম্প্রদায়ের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। তাছাড়া পরেশনাথ পাহাড় তাদের কাছে আনন্দী-তীর্থ। অথচ 'মূর্তিপূজক' শ্বেতাম্বরদের আনন্দীতীর্থ হল পলিতানার (গুজরাত) শত্রুঞ্জয় পাহাড়।

জৈনদের মতে পরেশনাথ পাহাড়ই তীর্থঙ্করদের একমাত্র মহানির্বাণ ক্ষেত্র। যাঁরা এই মহাতীর্থ পরিক্রমা করেন, তাঁরা 'ভব্যপুরুষ' তাঁরা ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভ করতে পারবেন।

বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামানো হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে সেখানে এসে দাঁড়াই। নিজের মালপত্র বলতে তো থলিটি, সেটি আমার সঙ্গেই রয়েছে। একা পথে বেরুলেও এখন আমি আর একা নই। মিস্টার শীলের মেয়ে শ্যামলী ওরফে খুকু ও তার ছোট ভাই সুজন তোপচাঁচি থেকে আমার সঙ্গী হয়েছে। পথের পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব ভালবাসা ও আত্মীয়তা স্থাপনের বহু নজীর আছে এ সংসারে।

কাল সারাদিন ওদের বড়ই ধকল গেছে। তাড়াতাড়ি তোপচাঁচি পৌঁছবেন বলে মিস্টার শীল আমার সঙ্গে ধানবাদ না নেমে গোমোতে নেমেছেন। কিন্তু হায়, একাধিক দালাল লাগিয়ে, সারাদিন চেষ্টা করে তাঁর লটবহর বহন করার উপযুক্ত কোন যন্ত্রযানের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে মিস্টার শীল আদি ও অকৃত্রিম গো-যানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অরণ্যচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে, অরণ্য-পথ দিয়ে সন্ধ্যের পরে কোনক্রমে তোপচাঁচি পৌঁচেছিলেন। আমরা লেক্ হাউসে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। কিন্তু সে অভ্যর্থনায় সাড়া দেবার মতো দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তখন তাঁদের ছিল না। তাঁরা তখন আশ্রয় চাইছিলেন—বিশ্রাম চাইছিলেন।

সারারাত ঘুমুতে পেরে শীল এ্যাণ্ড কোম্পানী আজ সকালে আবার তাঁদের পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। সাত সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন, তাঁদের হ্রদ দর্শনের ও নৌ-বিহারের সঙ্গী হতে বাধ্য করেছেন। আর এই নৌকাবিলাসের সময়েই আমার পরেশনাথ দর্শনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছে শ্যামলী। অনেক আব্দার ও অভিমান করে শেষ

পর্যন্ত সুজনকে নিয়ে আমার সঙ্গী হতে পেরেছে। পরশু সকালের বাসে ওরা ফিরে যাবে তোপচাঁচি, আমি চলে যাব গিরিডি।

একটি ছেলেকে পাওয়া গেল। তারই মাথায় ওদের বিছানা ও সুটকেশ চাপিয়ে আমরা দিগম্বর জৈন ধর্মশালার সামনে এসে দাঁড়াই। চৌকিদার তার কয়েকজন ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। আশ্রয় ভিক্ষা করতেই সে গোয়েন্দাসুলভ দৃষ্টিতে আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কাঁহাসে আতে হ্যাঁয় ?"

"কলকাতা থেকে।" সবিনয়ে উত্তর দিই।

"বঙ্গালী।"

"হ্যাঁ।"

"মছলী খাতে হ্যাঁয় ?"

"আজ্ঞে..."

"ইহাঁ নহী হোগা। দুস্‌রা ধর্মশালা ঢুঁড়িয়ে।"

এরপর আর অনুরোধ করা বৃথা। আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ি। কিন্তু এ যে মহাসমস্যায় পড়া গেল। একা হলে কোন ভাবনা ছিল না, একটা গাছতলায় বা দোকানের দাওয়ায় কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে শ্যামলী—মডার্ন কলেজ গার্ল। তার ওপর সুজন—ধনীর দুলাল। ওরা অসহায় দৃষ্টিতে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

চিন্তিত মনে শ্বেতাম্বর ধর্মশালার সামনে এসে দাঁড়াই। চৌকিদার নিজেই আমাদের কাছে ডাকে। কৃপাপ্রার্থীর মতো এগিয়ে আসি। চৌকিদার জিজ্ঞেস করে, "দিগম্বর ঘর দিল না বুঝি ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিই।

"হুম্‌। এখানেও মাছ-টাছ খাওয়া চলবে না কিন্তু।"

আমি আশান্বিত হয়ে জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করি, "রাম রাম কি যে বলেন। আমরা তো কলকাতায়ও আজকাল মাছ পাই না।"

"কলকাতায় যা ইচ্ছে খান গে। এখানে না খেলেই হল। তা একটা ঘর হলে চলবে তো?"

ঘরখানি শ্যামলীর খুব পছন্দ হল। ওর খুশি দেখে হাসি পায়। বিচিত্র মেয়েদের মন। সুন্দর ঘরের প্রতি আকর্ষণ ওদের সহজাত — সে ঘর এক রাতের আশ্রয় হোক, বা সারা জীবনের আবাস হোক।

ধর্মশালার অতিকায় ইঁদারা থেকে চৌকিদার জল তুলে দিল। হাত মুখ ধুয়ে ধর্মশালার পেছনের দোকান থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ে নেওয়া গেল। আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়লাম সকলে। শেষ রাতে উঠতে হবে। আমার বিছানার পাশেই একটা খোলা জানলা।

নির্মল আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ—মধুর জ্যোৎস্নায় মধুবনকে মধুময় করে তুলেছে। ঝিরঝিরে শরতের স্নিগ্ধ সমীর বইছে। শ্যামলী ও সুজনের আর কোন সাড়া পাচ্ছি না। ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করি।

ঘুম ভাঙে চৌকিদারের ডাকে। চাঁদ এখনও আকাশে। তাহলেও সময় নেই, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই। বাজারে এসে দেখি বাজার গরম। দৈনন্দিন জীবন শুরু হয়ে গেছে। মধুবনের জীবনযাত্রা চলে সমেদ-শিখর যাত্রাকে কেন্দ্র করে। তাই মধুবন এক প্রহর রাত থাকতে জেগে ওঠে, আবার সন্ধ্যের সময়েই ঘুমিয়ে পড়ে। পুণ্যার্থীদের কেউ কেউ দেখলাম খালি পেটেই পাহাড়ে চলেছেন। পুণ্যের প্রয়োজনে প্রাণ পরিত্যাগের প্রচুর নজীর আছে আমাদের দেশে। আমরা পুণ্যার্থী নই—সাধারণ যাত্রী। তাই বসে গেলাম এক হালুইকরের দোকানের সামনে। পেট পুরে চা সিঙাড়া পেঁড়া খেয়ে নিয়ে পথের খাবার সঙ্গে নেওয়া গেল। তারপর ওয়াটার বটলে জল ভরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলি।

যাত্রীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ে উঠছেন। প্রত্যেক

দলের সঙ্গেই আলো—কারও টর্চ কারও হ্যারিকেন কারও বা পেট্রো-ম্যাক্স। আমার সঙ্গে টর্চ রয়েছে। কিন্তু জ্বালাবার বড় একটা প্রয়োজন হচ্ছে না। ওদের আলোতেই আমরা আলোকিত—বেশ স্বচ্ছন্দে পথ চলতে পারছি। যাত্রীদের অধিকাংশই জৈন তীর্থযাত্রী। তবে আমাদের মতো সনাতন ধর্মী কয়েকজন পর্যটক রয়েছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে সব বয়সের নারী পুরুষই যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। সকলেই যে পদব্রজে চলেছেন তা নয়, কেউ কেউ পুণ্যের প্রয়োজনে মানুষের সওয়ার হয়েছেন—ডুলিতে বসে সমেদ-শিখরে আরোহণ করছেন।

প্রশস্ত পায়ে চলা চড়াই পথ, ঘন বাঁশবনের ভেতর দিয়ে পথ। অন্যান্য গাছপালাও অবশ্য আছে। দুয়েকটি আমগাছ ও কয়েকঝাড় কলাগাছের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

লাঠি ও টর্চ হাতে ওপরে উঠছি। পেছনে শ্যামলী ও সুজন। এমন পথ পেরুবার অভ্যেস নেই ওদের। তাই আমাকে খুব ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছে। তবে শুধু যে ওদের অবস্থাই কাহিল হয়েছে তাই নয়, অনেকেই খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আর কেবলই বসতে চাচ্ছেন। কিন্তু ছড়িদাররা আশ্বাস দিচ্ছে—আমরা তো প্রায় এ পাহাড়ের মাথায় এসে গেছি, এর পরেই উতরাই।

পাহাড়ের মাথায় খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া গেল। তারপরে উতরাই পথ ধরে সামান্য কিছুটা নেমে, একটা ছোট প্রায়-সমতল উপত্যকা পেরিয়ে মূল-পাহাড়ে উঠতে শুরু করি। ঘন বনাবৃত স্যাঁত-সেঁতে শেওলা ছাওয়া পিচ্ছিল চড়াই পথ। যাত্রীরা আবার বিশ্রামের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। ছড়িদাররা আবার আশ্বাস দিচ্ছে—আর একটু চলুন, ঘর পাবেন, ঝরণার মিঠে জল পাবেন।

ঝরণার কাছে যখন পৌছলাম, তখন চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে ঝরণার কলতানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে জানা অজানা অসংখ্য ছোট-ছোট পাখি। সবার সঙ্গে আমরাও একখানি পাথরে বসে পড়লাম।

ছড়িদার ঘরের লোভ দেখিয়েছিল। কিন্তু ঘরকে যারা পর করে এই
শীতে পথে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা কি আর ঘরে যেতে চান। ঘর রইল
পরে, সবাই ঝরণার ধারে ধারে পাথরে বসে বিশ্রাম করে নিলেন।

এই ঝরণাকে বলে গন্ধর্বধারা। আমরা মধুবন থেকে দু মাইল
এসেছি।

মাইলখানেক এগিয়ে দুদিকে দুটি পথ। বাঁদিকেরটি সিঁড়ি
বাঁধানো। পূর্ণ পরিক্রমা করতে হলে এই পথে ওপরে উঠতে হবে
ডানদিকেরটি আঁকাবাঁকা পিচ্ছিল পাহাড়ী পথ। সোজা পরেশনাথ
মন্দিরে চলে গেছে। পরিক্রমা পূর্ণ করে যাত্রীরা এই পথেই ফিরে
আসেন। কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্যই এক মাইল পথ সিঁড়ি
বাঁধিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা বড় কষ্টকর।

হিমালয় ছাড়া ভারতে আরও পাঁচটি উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণী রয়েছে
—আরাবল্লী, বিন্ধ্য, পশ্চিম ঘাট, পূর্ব ঘাট ও ছোটনাগপুর। আপাত
দৃষ্টিতে মনে না হলেও, পরেশনাথ ছোটনাগপুর পর্বতশ্রেণীরই অন্তর্গত
ও উচ্চতম। চারিদিকে সমতলক্ষেত্র, তারই মাঝে মোচাকৃতি ঘন ধূসর
রঙের ৪৪৮১ ফুট উঁচু এই পাহাড়টির একক অবস্থান সত্যই বিস্ময়কর
কিন্তু আরও বিস্ময়ের হল তীর্থঙ্করগণ এই পাহাড়কেই তাঁদের নির্বাণ
ক্ষেত্র বলে নির্বাচিত করেছিলেন। যুগে যুগে হিমালয় কেবল মুক্ত
পুরুষদের আকর্ষণ করেছে। ধ্যানগম্ভীর হিমালয়কে ছেড়ে তাঁরা কেন
যে এই পাহাড়ে এলেন তার কারণ আজও জানা যায় নি। কারণ যাই
হোক ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও একশ' বছর বয়সে এক শ্রাবণী শুক্লা
অষ্টমীতে (শ্রবণী নক্ষত্রে) এখানে এসে তিরাশি জন শিষ্য পরিবৃত
অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর নাম অনুসারেই এই পাহাড়ের
নাম হয় পরেশনাথ। তবে জৈনশাস্ত্রে এই পুণ্য পাহাড় সমেদ-শিখর
নামে পরিচিত।

পার্শ্বনাথের পূর্বে আরও যে ১৯ জন তীর্থঙ্কর এখানে এসে দেহত্যাগ
করেছেন, তাঁরা হলেন—অজিতনাথ, শম্ভুনাথ, অভিনন্দননাথ

সুমতিনাথ, পদ্মপ্রভানাথ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভানাথ, পুষ্পদন্ত (সুবিধ), শীতলনাথ, শ্রীহংসনাথ, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, আরানাথ, মল্লীনাথ, মুনিসুব্রতনাথ ও নেমিনাথ (অরিষ্টনেমি)।

প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের নাম বাদ দিলাম, কারণ দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথই এখানে এসে প্রথম দেহত্যাগ করার প্রথা প্রচলন করেন। কিন্তু ১২শ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য ও ২১শ তীর্থঙ্কর নামীনাথ কেন এখানে আসেন নি, বুঝতে পারছি না।

সাঁওতালদের কাছেও এ পাহাড় পুণ্যক্ষেত্র বলে বিবেচিত। কিন্তু জৈনতীর্থ হিসেবেই পরেশনাথ পৃথিবী বিখ্যাত। অথচ এ তীর্থ বৌদ্ধ তীর্থও হতে পারত।

বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে—ঋষভদেব (বৃষভদেব) নামে জনৈক বেদজ্ঞ রাজা পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বলি ও প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু করেন। তিনিই শ্রমণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা —প্রথম অর্হৎ বা তীর্থঙ্কর।

২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ভাই। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। বিফলকাম হয়েছেন। কিন্তু তিনি শ্রমণ সংঘকে শান্তি ও অহিংসার আদর্শ প্রচারের জন্যই উৎসর্গ করেন। পরবর্তী তীর্থঙ্করই হলেন ইক্ষাকু বংশীয় কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র পার্শ্বনাথ। তিনি খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে বারাণসীধামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল পুরীসুধন্য বা জনপ্রিয়। তিনি কুশস্থলরাজ নরবর্মনের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। যথাকালে তাঁদের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই রাজা প্রসেনজিৎ। পার্শ্বনাথ তিরিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর সংসার ত্যাগের কাহিনীটি একটু বিচিত্র। তিনি 'বিশাল' নামে এক পালঙ্কে করে বারাণসী পরিক্রমা করেন। তারপরে আশ্রম-পদ উদ্যানে সাড়ে তিন দিন উপবাসী থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। পার্শ্বনাথ তিরাশি দিন তপস্যা করে 'কেবল' বা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তিনি পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদের উপদেশামৃত সংকলন করেন এবং তাঁর মতবাদকে নিগ্রন্থিধর্ম বলে ঘোষণা করেন। সংঘ ধর্মে পরিণত হল।

২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন প্রায় আড়াই শ' বছর পরে খৃঃ পূঃ ৬১৮ অব্দে। তাঁর মাতা বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকন্যা ত্রিশলা দেবী ও পিতা বৈশালীর উপকণ্ঠে ও পাটনার সাতাশ মাইল উত্তরে অবস্থিত কৌদিন্যপুরের (কুন্দগ্রাম) রাজা। বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন লুম্বিনীতে খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে। মহাবীর বাহাত্তর বছর বয়সে খৃঃ পূঃ ৫৪৬ অব্দে দেহত্যাগ ত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব আশি বছর বয়সে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে নির্বাণ লাভ করেন। অতএব ছুজনেই সমসাময়িক। কুন্দগ্রাম ও কপিলাবস্তুর সরাসরি দূরত্ব মাত্র শ' দেড়েক মাইল। কাজেই তাঁরা ছিলেন এক দেশীয়। অতএব উভয়ের মধ্যে পরিচয় এমন কি সখ্যতা থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁরা ভিন্ন মত প্রচার করেছিলেন। ফলে নিগ্রন্থি ধর্মাবলম্বীরা ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মহাবীর পূর্বতন তীর্থঙ্করদের স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে ২৫শ তীর্থঙ্কর বলে ঘোষণা করেন। তাঁর সংঘ জীন (বিজয়ী) বা জৈন বলে পরিচিত হল। বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদের স্বীকার না করে নতুন সংঘ গড়ে তুললেন। তাই পরেশনাথ কেবল জৈন তীর্থঙ্করদেরই মহানির্বাণক্ষেত্র, এই মহাতীর্থ বৌদ্ধতীর্থ নয়।

অবশেষে চড়াই পথ শেষ হল। আমরা একে একে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে এলাম। মধুবন থেকে ছ মাইল হেঁটেছি। সমতল পেয়ে শ্যামলীর আনন্দ আর ধরে না। সে ঝুপ করে পথের পাশেই বসে পড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, "যাক বাঁচা গেল। আপনারা এত কষ্ট করে কেন যে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান, বুঝতে পারি না।

আমি বুঝতে পারি, ওর বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই মৃত্থ হেসে আমিও শ্যামলীর পাশে বসি, সুজনকেও বসতে ইশারা করি। কিন্তু কোন কথা বলি না। শ্যামলীর প্রশ্নের কি উত্তর দেব? শিশু

কেন মায়ের ডাকে সাড়া দেয়, সম্রাট কেন সন্ন্যাসী হয়, মানুষ কেন শহীদ হয় ? যুক্তি দিয়ে কি মুক্তির কথা বোঝানো যায় ?

ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। বেশ ভাল লাগছে। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর- যেন রূপকথার রাজ্য। পাহাড়ের শীর্ষদেশ সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত। এখানে গাছপালা একরকম নেই বললেই চলে। কিন্তু নিচের দিকে একটির পরে একটি বনময় গিরিশিরা। ছোট হলেও চারিদিকে একটা পাহাড় পাহাড় ভাব আছে। ফলে পাহাড়ে ওঠার অনুভূতি হচ্ছে মনে। শিখরদেশ একেবারে সমতল না হলেও খুব অসমতল নয়। সব মিলিয়ে ছোট ছোট চব্বিশটি শিখব আছে পরেশনাথ পাহাড়ে। প্রতি শিখরেই একটি করে মন্দির। বিশজন তীর্থঙ্করদের সমাধি-মন্দিব। সব মন্দির দর্শন করে পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে উচ্চতম শিখরে অবস্থিত পরেশনাথ মন্দিরে পৌছতে হলে ছ' মাইল পরিক্রমা করতে হয়। পরেশনাথ মন্দির থেকেও মধু-বনের দূরত্ব ছ' মাইল।

চকচকে রোদটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে এক ঝাঁক কালো মেঘ ছেয়ে ফেলল পরেশনাথের আকাশ। শ্যামলী আঁতকে ওঠে, বলে, বৃষ্টি নামবে নাকি ?"

"নামতে পারে।"

"তাহলে যে ভিজে যাবো।"

"উপায় কি ?"

"যদি অসুখ হয় ?"

"তখন ওষুধ খাবে, এখন তো চল। তাড়াতাড়ি পরিক্রমা সেরে মধুবনে ফিরে যাওয়া যাক। পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলে আবার বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে।"

শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠে দাড়ায়। এগিয়ে চলে গৌতম স্বামী শিখরের দিকে। তারপরে আমরা খানিকটা বাঁ দিকে এগিয়ে উঠে আসি চন্দ্রপ্রভানাথ মন্দিবে। এ মন্দিরটি উচ্চতায় দ্বিতীয়।

অভিনন্দননাথ মন্দির দর্শন করে নেমে আসি তলহাটির জলমন্দিরে। এই মনোরম ও সুবিশাল মন্দিরে তীর্থঙ্করদের মূর্তি আছে।

আবার ফিরে এলাম গৌতম শিখরে। এগিয়ে চললাম পরেশনাথ মন্দিরের দিকে। পথে ছোট ছোট আরও কয়েকটি মন্দির দর্শন করলাম। প্রায় সব মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ এক জোড়া পদচিহ্ন। পরেশনাথ মন্দিরই এই শিখর-তীর্থের মূল-মন্দির।

মন্দিরের নিচে ডাকবাংলো। সেনাবাহিনীর ইংরেজ অফিসারদের স্বাস্থ্যাবাস হিসেবে ১৮৭৪ সালে এই বাংলো নির্মিত হয়। কখনও কখনও বাংলার ছোটলাট এখানে এসে বিশ্রাম করে যেতেন। বলা বাহুল্য তখন পরেশনাথ ছিল বাংলার অন্তর্গত। কাজেই একে ডাক-বাংলো না বলে রাজভবন বলাই ভাল। সংস্কারের অভাবে ভবনটি এখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও প্রাকৃতিক পরিবেশ তেমনি রাজকীয় রয়েছে। অনায়াসে একটা রাত এই প্রাক্তন রাজভবনে অতিবাহিত করে একদিন কা সুলতান হতে পারি। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ। শ্যামলী ও সুজন সঙ্গে রয়েছে। রাজা হওয়া হল না আমার।

ডাকবাংলোর সামনে নিমিয়াঘাটের পথ মধুবনের পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখান থেকে নিমিয়াঘাট সাত মাইল। অনেকে মধুবন থেকে এসে মন্দির দর্শন করে নিমিয়াঘাটে নেমে যান। তাতে পুণ্য বেশি হয় কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত পাহাড়টিকে প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য হয়।

একে তো নিমিয়াঘাটের রাস্তাটি মোটরপথ। তার ওপরে সেখান থেকে তোপচাঁচি হয়ে ধানবাদ যাবার বাস অথবা ট্যাক্সি পাওয়া সহজ, দূরত্বও কম। এখানে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে এই পথে ধানবাদ গেলে ব্ল্যাক্ ডায়মণ্ড এক্সপ্রেস ধরে সেদিনই রাত সাড়ে নটায় হাওড়া পৌঁছন যায়। আমি হাওড়া ফিরব না। তাছাড়া আমাদের মালপত্র রেখে এসেছি মধুবনে। অতএব এপথে ফেরা হবে না আমাদের।

পরেশনাথ পাহাড়েও শৈলারোহণ শিক্ষা দেবার উপযোগী চমৎকার 'রক্স' (Rocks) রয়েছে। তার ওপরে আছে এতবড় ডাকবাংলো। জলের অভাব নেই। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষার্থীরা পাহাড়ের ওপরে থাকার সুযোগ পান এবং এখানকার পরিবেশ খুবই রমণীয়।

সুতরাং শুশুনিয়ার মতো এখানেও শৈলারোহণ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। আর তাই কয়েক বছর আগে কলকাতার হিমালয়ান ফেডারেশন এখানে একটি সুন্দর শিক্ষাক্রম পরিচালনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তারপরে আর কোন সংস্থা তাঁদের সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নি।

দুধারে রেলিং ঘেরা প্রশস্ত সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে উঠে এলাম। চারিদিকে পাঁচিল। শ্বেতপাথরের ঝক্‌ঝকে মন্দির। হিন্দু ও মোগল স্থাপত্যকলার সমন্বয়ে নির্মিত। প্রথম তৈরি করার সময় খরচ হয়েছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। বলা বাহুল্য সেটা 'ডিয়ারনেস্ এ্যালাউয়েন্স'-এর যুগ নয়। তখন টাকার মূল্য ছিল কম করেও এখনকার বিশগুণ। কয়েক বছর আগে মন্দিরটি আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। মসৃণ সাদা ও কালো পাথরের নকশা-কাটা ঝক্‌ঝকে মেঝে। ছোট মন্দির। মাঝখানে একটি ঝুলন্ত ঘণ্টা। বাঁ দিকে গর্ভগৃহ। সেখানে অপরূপ কারুকার্য মণ্ডিত মূল্যবান পাথরের সিংহাসন পাদপদ্মের বেদী। বেদীর ওপরে দুটি পদচিহ্ন পরেশনাথের প্রতীক।

শান্ত সমাহিত পরিবেশে ধ্যানমগ্ন মৌন-মন্দির। সদাচঞ্চল তার্কিকও এখানে এলে শান্ত হয়ে যায়, গম্ভীর হয়ে যায়, উদাস হয়ে যায়। তার কথা যায় ফুরিয়ে, হাসি যায় হারিয়ে। সে নিজের মনের মুকুরে নিজেকে দেখে —আত্মবিশ্লেষণ করে। সে চাওয়া পাওয়ার অসারতা বুঝতে পারে, সুখ-দুঃখের সীমারেখা হারিয়ে ফেলে। তার মনে পড়ে সেই মহামানবদের কথা যাঁরা মানুষের মঙ্গল-সাধনের

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারপর তাঁদের মরদেহ রক্ষা করতে এসেছিলেন এই শৈল শিখরে। কিন্তু তাঁরা আত্মদান করেও অবিনশ্বর—তাঁরা মিশে আছেন এই মহাতীর্থের মাটিতে আর ঐ অসীম অনন্ত আকাশে।

তাই পরেশনাথ দেবভূমি না হয়েও পরম-তীর্থ। সে স্বর্গের দেবতার লীলাভূমি নয়, মর্তের মানুষের মুক্তিক্ষেত্র। সকল কালের সকল দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

হাজারিবাগ

ইস্‌রি বাস স্ট্যাণ্ডে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। আমি ধানবাদের বাস থেকে নেমে পড়লাম, ওরা বাসে বসে রইল। শ্যামলী ও সুজন চলেছে তোপচাঁচি ফিরে যাচ্ছে মা-বাবার কাছে। আমি চলেছি হাজারিবাগ।

ভেবেছিলাম পরেশনাথ থেকে গিরিডি চলে যাব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। শ্যামলী একরকম জোর করেই আমাকে ধানবাদের বাসে চাপিয়ে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আর এতদূর যখন এসেই পড়েছি, তখন হাজারিবাগটা ঘুরে না যাবার কোন মানেই হয় না।

কণ্ডাক্টারের নির্দেশে ড্রাইভার ওদের গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি চলতে শুরু করল। শ্যামলী গলা বাড়িয়ে পেছন ফিরে কি যেন বলতে চাইছে আমাকে। কিন্তু গাড়ির গর্জনে ওর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছল না। শুধু দেখতে পেলাম, সে একখানি হাত নাড়ছে আর করুণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে।

আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। আমরা উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কেন? কি প্রয়োজন ছিল আমারি ঐ বাস থেকে নামার। আমিও তো অনায়াসে চলে যেতে পারতাম তোপচাঁচি। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে এক সঙ্গে ফিরতে পারতাম কলকাতা। কিন্তু তার পরে··· ?

উদার অনন্ত আকাশতলে, প্রকৃতির প্রভাবে যা ভাল লাগে, যাকে ভালবাসি, ইট আর পিচের শহরে তা ভাল লাগে না, তাকে ভালবাসতে পারি না। তাই পথের পরিচয়কে পথেই বিদায় দিতে হয়।

সুতরাং শ্যামলীর কথা থাক। আমি পথিক, পথের কথাই বলা যাক।

কলকাতা থেকে সোজা হাজারিবাগ আসার সহজ পথ—হাওড়া থেকে রাত সাড়ে আটটায় তুন এক্সপ্রেসে চেপে ভোর চারটেয় হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে, সেখান থেকে বাসে ৪০ মাইল। হাওড়া থেকে হাজারিবাগ রোড ৩৩৩ কিলোমিটার বা ২০৮ মাইল। হাজারিবাগ রোড থেকে হাজারিবাগ শহরে নিয়মিত বাস চলে। তাছাড়া ধানবাদ থেকে বাসে এখানে এসেও হাজারিবাগের বাস ধরা যায়।

হাজারিবাগ রোড রেল স্টেশনটি কিন্তু অবজ্ঞার নয়। ১৯২২ সালের বর্ণনায় এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এখন কেউই তার হদিস দিতে পারে না। এই অঞ্চলে প্রস্তর যুগের শেষদিকের (Neolithic) ও তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ইদানীং খননকার্যের ফলে বৌদ্ধযুগের কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যাঁরা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন, তাদেরই পূর্বপুরুষগণ তিন হাজার বছর আগে সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন—ইতিহাসের কি বিচিত্র বিচার।

আদিবাসীরা ভারতের আদি অধিবাসীদেরই বংশধর। আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পর্বত ও অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর সুদীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না। পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে সভ্যতার আলো তাদের মাটির ঘরের দাওয়ায় এসে আছাড় খেয়ে পড়ে নি, যুগের হাওয়া তাদের গায়ে লাগে নি। কিছুকাল পূর্বেও ছোটনাগপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গহনতম প্রদেশের অধিবাসীরা বস্ত্রের ব্যবহার জানতেন না।

সভ্যতার সংস্পর্শে না এলেও স্বাধীনতার প্রতি আদিবাসীদের, বিশেষ করে সাঁওতালদের, মমত্ববোধ অত্যন্ত গভীর। তাই ১৭৯৫ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত মারাঠা ও পিণ্ডারিদের আক্রমণের মুখে পূর্বভারত প্রতিরক্ষায় তাঁরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছেন। স্থানীয়

জমিদারদের সহযোগিতায় ও ইংরেজদের পরিচালনায় পশ্চিম দিনাজপুর থেকে শোন নদীর তীর পর্যন্ত, এই সুবিশাল ভূখণ্ডের জনসাধারণ, প্রত্যেকটি সম্ভাব্য পথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সেদিন যদি আদিবাসীরা মারাঠা ও পিণ্ডারিদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ না হতেন, তাহলে আজ হয়তো ভারত-ইতিহাসের ধারা অন্যখাতে বয়ে যেত।

যে স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে আদিবাসীরা ইংরেজদের সাহায্য নিয়েছিলেন, সেই স্বাধীনতার জন্যই তাঁরা মাত্র চল্লিশ বছর বাদে ইংরেজকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। এই স্বাধীনতার যুদ্ধকে ইংরেজরা সাঁওতাল বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন।

ইংরেজী ১৮৫৫ সাল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে সারা ভারতে কায়েম হয়ে বসেছে। জনসাধারণ তখন পরাধীনতার জ্বালা প্রথম উপলব্ধি করতে শুরু করছেন। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সাঁওতালরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। এই সঙ্কল্পের প্রথম প্রকাশই সাঁওতাল বিদ্রোহ। আমরা অবশ্য একে আদিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেই অভিহিত করব। ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকেই রাজমহল ও ভাগলপুরের সাঁওতালরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সিধু মাঝি নামে এক সাঁওতাল সর্দার ভাগলপুরের যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। নভেম্বর মাসে বীরভূমের আদিবাসীরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। হাজারিবাগ তখন শান্ত। অথচ এই জেলার সাঁওতাল নায়ক অর্জুন মাঝির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গেল। তাঁর সন্ধানের বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। ফলে অর্জুন মাঝি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। হাজারিবাগেও যুদ্ধ সম্প্রসারিত হল।

এই দুর্ভাগা দেশে কোনকালেই বিশ্বাসঘাতকের অভাব হয় নি। অর্জুনের এক বিশ্বাসঘাতক অনুচর তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিল। সন্তুষ্ট সাহেবরা তাঁকে পঞ্চাশ টাকার বদলে আটার টাকা পুরস্কার দিলেন।

অনেকের মতে অর্জুন মাঝি ইচ্ছে করেই ইংরেজদের হাতে ধরা

দিয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালে সিন্ধু দখল করে ইংরেজরা আমীরদের হাজারিবাগে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আজও তাঁদের বংশধরগণ হাজারিবাগে বাস করছেন। তাঁদের পল্লী এখনও নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত। আমীরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই নাকি অর্জুন মাঝি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে হাজারিবাগে এসেছিলেন। অর্জুন মাঝির অনুরোধে আমীররা সোনা দিয়ে সাঁওতালদের সাহায্য করেছিলেন। ফলে ফেব্রুয়ারী মাসে বিপ্লব ভীষণ আকার ধারণ করে।

সাঁওতালদের বীরত্ব যতই প্রশংসনীয় হোক, শক্তিতে তাঁরা ইংরেজদের চেয়ে হীনবল ছিলেন। তীর-ধনুকই তাঁদের একমাত্র সম্বল। ইংরেজ সৈন্যদের কামান ও বন্দুকের বিরুদ্ধে স্বভাবতই তাঁরা পেরে উঠলেন না। মার্চ মাসে যুদ্ধ মোটামুটি থেমে গেল। দুঃখের কথা এই যুদ্ধে শিখ সৈন্যরা সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের প্রধান সহায় হয়েছিলেন।

অনেকের মতে সাঁওতালরা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ইচ্ছে করেই যুদ্ধ স্থগিত রেখেছিলেন। তাঁরা সিপাহীদের প্রস্তুতির কথা জানতেন। একই সঙ্গে তাঁরা ইংরেজদের আঘাত করতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৭ সাল। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সিপাহীরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলেন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল—দমদম, ব্যারাকপুর, বহরমপুর, মীরাট, দিল্লী, কানপুর, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসী, আরা…সারা ভারত। সাঁওতালরা এই ব্রাহ্মমুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে আবার হাজারিবাগে আগুন জ্বলল। রূপ মাঝি, রঘু মাঝি ও কোকা কুমার এই যুদ্ধের নেতৃত্ব করেন। অক্টোবর মাসে অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যের হাতে হাজারিবাগ শহরের ভার দিয়ে সমস্ত দেশীয় সৈন্যদের চারিদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অর্জুন মাঝি আর ইংরেজদের আতিথ্য গ্রহণ পছন্দ করলেন না। তিনি পালিয়ে গেলেন কারাগার থেকে—যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন নিজ হাতে। তাঁকে ধরিয়ে দেবার

জন্য দু'শ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। কিন্তু সে পুরস্কার দেবার সৌভাগ্য ইংরেজদের আর হয়ে ওঠে নি।

নানাসাহেব পারেন নি। অর্জুন মাঝিও পারলেন না। স্বাভাবিক-ভাবেই সিপাহী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল। নানাসাহেবদের আমরা ভুলি নি, কিন্তু অর্জুন মাঝিদের ভুলে গেছি। শুধু ঐতিহাসিকদের কাছে নয়, ঔপন্যাসিকদের কাছেও অর্জুন মাঝি আজ উপেক্ষিত।

সাঁওতালদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিফল হল। কিন্তু ইংরেজরা বুঝতে পারলেন এই স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিকে বশীভূত করতে হলে অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে। সে পথ শক্তির নয় শান্তির, হিংসার নয় প্রেমের। তাই বন্দুকের বদলে আমদানি করা হল ক্রস। সেনানায়কদের বদলে দলে দলে মিশনারী এলেন। তাঁরা সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগ-পুরের গ্রামে গ্রামে মিশন খুলে প্রেম-মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকলেন। যাঁরা সেনানায়কদের অনুগত হন নি, তাঁরা মিশনারীদের অনুগত হলেন। সরল সাঁওতালদের স্বাধীন সত্তার মৃত্যু হল।

সেকালে এ অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান তিনটি ঘাঁটি ছিল—পুরুলিয়া, রাঁচি ও হাজারিবাগ। হাজারিবাগে পথের দুধারে এখনও মিশন আর মিশনারী স্কুলের ছড়াছড়ি।

সাঁওতালদের মধ্যে যাঁরা খ্রীষ্টান হয়েছেন তাঁরা আজও নিজেদের সামাজিক প্রথা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন নি। এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প আছে।

একবার এক পাদ্রী সাহেব তাঁর শিষ্যদের নতুন ধর্মের প্রতি আনু-গত্যের পরীক্ষা করতে, কোন এক সাঁওতাল গাঁয়ে এলেন। গাঁয়ে ঢুকেই সাহেব অবাক। বড়দিন নয়, নিউইয়ার নয় এমন কি গুড ফ্রাইডে নয়—অথচ গ্রামখানি উৎসব মুখর। মেলা বসেছে, ছোটবড় সবাই নতুন পোশাক পরে সেখানে ভিড় জমিয়েছে। ম্যাজিক চড়ক ও যাত্রার আসর বসেছে। চিন্তিত সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন

গাঁয়ের মাঝির (মোড়ল) বাড়িতে। হতাশ হলেন। অন্যান্য বাড়ির তুলনায় সে বাড়িতে সোরগোলটা আরও বেশি—ঢোল ও করতাল বাজছে।

খবর পেয়ে মাঝি বেরিয়ে এলেন বাইরে। হাসিমুখে সাহেবকে নমস্কার করে বললেন, "ভালই হল। আজকের দিনে আপনি এসেছেন। একেবারে প্রসাদ নিয়ে যাবেন।"

"প্রসাদ!" সাহেব চিৎকার করে ওঠেন, "কিসের প্রসাদ?"

"বাঃ আজ যে আমাদের চটাপটা পরব!" মাঝি সাহেবের অজ্ঞতায় বিস্মিত হলেন।

মরিয়া হয়ে সাহেব মাঝিকে চরম প্রশ্ন করেন, "তোমরা এ গাঁয়ের সবাই না খ্রীষ্টান হয়েছ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছি।"

"তাহলে তোমরা চটাপটা করছো কেন?"

"কি যে বলেন! আমাদের বর্ষার পরব, পটা মহাদেবের পুজো করবো না?"

"না। তোমরা খ্রীষ্টান হয়েছ। এসব পটাফটা তোমাদের চলবে না।"

"কি বললেন? খেরেস্তান হয়েছি বসে পটার পুজো করবো না? তাহলে তোমার খেরেস্তানী নিয়ে তুমি থাকো সাহেব। আমরা সাঁওতাল আছি, সাঁওতালই থাকবো।"

আমাদের বাস যখন হাজারিবাগ স্ট্যাণ্ডে এসে স্থির হল, তখন পথের বুকে ছায়া নেমে এসেছে। বিকেলের সোনালী রোদ শাল আর মহুয়ার মাথায় গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। গোধূলি সমাগত।

ঝোলাটি পিঠে বেঁধে বাস থেকে নেমে পড়ি। শহরের পথ ধরে এগিয়ে চলি। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য—চারিদিকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ের কালো রেখা। ছবির মতো বাড়িঘর—সুন্দর শহর। সবচেয়ে

সুন্দর হল তার পথ। এমন নির্জন ছায়া সুনিবিড় ঝক্‌ঝকে পথ আমি খুব বেশি দেখি নি।

হাজারিবাগের উচ্চতা সমুদ্র-সমতা থেকে তেরশ' ফুট। এখনও স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে হাজারিবাগের সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। তাই এখানে বহু দেশী বিদেশী হোটেল গড়ে উঠেছে। একটি দেশী হোটেলে ঠাঁই নেওয়া গেল। এখানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং পি. ডাব্‌লু. ডি-র ডাক-বাংলোও রয়েছে। কিন্তু এই অবেলায় হঠাৎ গিয়ে উঠলে, সেখানে ঠাঁই না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া একটা তো রাত। কাল সারাদিন সারারাত পথেই কাটবে -- পরশু বিকেলের বাস ধরে চলে যাব গিরিডি। সেখান থেকে মধুপুর হয়ে দেওঘর।

তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে-- সেণ্ট্রাল জেল দেখতে। এই জেলখানা ভারতের বৃহত্তম জেলখানা-গুলির অন্যতম। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিছু-কাল বন্দী ছিলেন এখানে। জেলখানা ছাড়াও হাজারিবাগে রয়েছে অপরাধীদের শোধনাগার (Reformatory School) আর পুলিস ট্রেনিং কলেজ।

হাজারিবাগ জেলা সদর। কাজেই এখানে বহু সরকারী অফিস রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য গীর্জা ও কয়েকটি মিশনারী স্কুল। বহু অবস্থাপন্ন বাঙালী তাঁদের ছেলেদের এই সব বোর্ডিং স্কুলে রেখে লেখাপড়া শেখান।

পরদিন ভোরে হোটেলের প্রাতঃরাশ সেরে ক্যামেরা কাঁধে আবার বেরিয়ে পড়ি পথে। এগিয়ে চলি কানারি হিলের দিকে। এই পাহাড়ের ওপর থেকে শহরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়।

সম্প্রতি শহর থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত গভীর জঙ্গলের সাত বর্গমাইল অংশকে ন্যাশনাল পার্ক (Rajdewra Wild Life

Sanctuary) বা বন্য জন্তুদের নিরাপদ বাসভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। এই সংরক্ষিত বনভূমিতে বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, হায়না, হরিণ, বনমোরগ, ময়ূর, সবুজ পায়রা ও নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি নির্ভয়ে বাস করে। এখানে শিকার নিষিদ্ধ। তবে সরকার শিকারীদের কথা একেবারে বিস্মৃত হন নি। তাই ন্যাশনাল পার্কের পাশের বনে ডাক-বাংলো তৈরি করে দিয়েছেন। হাজারিবাগে ফরেস্ট অফিসারের অনুমতি নিয়ে সেখানে শিকার করা যায়।

ন্যাশনাল পার্কে সারারাত কাটিয়ে হোটেলে ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে থলি পিঠে বাস স্ট্যাণ্ডে রওনা হলাম। তিনটেয় গিরিডির বাস ছাড়বে। গিরিডি হাজারিবাগ থেকে ১১৫ মাইল।

মানুষ মায়ায় আবদ্ধ, পথে বেরুলেও পিছুটান রয়ে যায়। তাই আজই আমাকে হাজারিবাগ থেকে বিদায় নিতে হতে হচ্ছে। অথচ হাজারিবাগকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বহু দর্শনীয় স্থান আছে। এদের মধ্যে প্রথম বলতে হয় তিলাইয়া বাঁধের কথা দামোদর উপত্যকা যোজনার রমণীয়তম জলাধার। চারিদিকে পাহাড়, তারই মাঝে শান্ত সুন্দর জলাশয়। বাঁধের পাশে পাহাড়ের ওপর ডি. ভি. সি.-র বাংলো। কলকাতার অ্যাণ্ডার্সন হাউস থেকে অনুমতি নিলে সেখানে বাস করা যায়। তিলাইয়াতে একটি ইয়ুথ হস্টেলও আছে। ঝুমরি তিলাইয়ার ইন্সপেক্টার অব্ স্কুলের কাছ থেকে বাস করার অনুমতি নিতে হয়। কলকাতা থেকে তিলাইয়া যাওয়ার সহজ পথ—কোডারমা (২৩৯ মাইল) রেল স্টেশনে নেমে, সেখান থেকে বাসে বারো মাইল।

তিলাইয়াতে দুটি হাইড্রো ইলেকট্রিক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এখন জলাশয়, আগে সেখানে বহু গ্রাম ছিল। বৃহত্তর প্রয়োজনে এই সব গ্রামকে জলমগ্ন করা হলেও গ্রামবাসীদের ভাসিয়ে দেওয়া হয় নি। জলাধারের আশেপাশে কয়েকটি আধুনিক

গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছে। ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে গ্রাম-গুলোকে ছবির মতো দেখায়।

হাজারিবাগ থেকে ৩৫ মাইল দূরে কোনার বাঁধ। তিলাইয়ার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। কোনার থেকে বেরমো ও বোকারো খুবই কাছে। বেরমো কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত। জাপানের সহায়তায় কোক কয়লা উৎপাদনের জন্য সেখানে একটি বিরাট ওয়াশারী নির্মিত হয়েছে। বোকারোর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। অনতিদূরে তৈরি হয়েছে স্টীল প্লাণ্ট।

টাটা মার্সেডিসের ডিজেল বাস দুর্বার গতিতে চলেছে ছুটে, মসৃণ পিচ-ঢালা পথে—হাজারিবাগ-গিরিডি রোডে। বহুক্ষণ হল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, রাতের আঁধার নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। তার-পরে ঐ মাটির সীমানার শেষে, যেখানে আকাশ এসে মিশেছে কালো পাহাড়ের বুকে, সেখানে চাঁদ উঠেছে। তার রুপোলী আলোয় আলো-কিত করেছে কঠিন-কালো পাহাড়, কোমল-সবুজ অরণ্য আর ধূসর প্রান্তর। আলোময় হয়েছে আকাশ, আলোময় হয়েছি আমরা। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বাসের জানালা দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে আমাদের গায়ে।

যাত্রার যতি আসন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গিরিডি পৌঁছব। কিন্তু চাঁদ তখনও রইবে আকাশে, পৃথিবীর আহ্নিক গতিও রইবে অপরিবর্তিত। মাটির মানুষ যেদিন মাটির পৃথিবীর মতন মর্ত্যের সকল আকর্ষণ উপেক্ষা করে, অবিচলিত পদক্ষেপে চলতে পারবে আপন কক্ষপথে, সেদিনই সে শুধু উদাত্ত স্বরে বলতে পারবে 'চরৈবেতি'···

কদিন থেকেই কি যেন হয়েছে। গরুটা একেবারেই দুধ দিচ্ছে না: অথচ বৈজু ভীলের গোয়ালের সেরা গরু এই সাদা গাইটা। বিস্মিত বৈজু বারে বারে ভাবে কেন এমন হল? কারণ বের করতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

পরদিন সকালে যথারীতি বৈজু গরুর পাল নিয়ে গ্রামের প্রান্তে বনের ধারে আসে। প্রখর নজর রাখে সেই সাদা গাইটার দিকে। কিন্তু তার চালচলনে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায় না।

প্রহর বাড়ে, সূর্য ওঠে মাথার ওপরে। শ্রান্ত বৈজু একটা মহুয়া গাছের ছায়ায় ছিল শুয়ে। গরুগুলো তেমনি আপন মনে মাঠে চরছে। হঠাৎ বৈজুর নজর পড়ে সেই সাদা গাইটার দিকে। সে বারে বারে তার দিকে তাকাচ্ছে আর ধীরে ধীরে বনের দিকে এগোচ্ছে। বৈজু চোখ বুজে ঘুমোবার ভান করে আর সেই ফাঁকে সাদা গাইটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বৈজু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, বনে প্রবেশ করে। খানিকক্ষণ চলার পরে গরুটাকে দেখতে পায়। সে চুপিচুপি তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

গরুটা হঠাৎ একখানি কালো পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপরেই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা—বিহ্বল বৈজু বিস্ফারিত নয়নে দেখতে পায়, তার সাদা গাইয়ের বাঁট থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় দুধ ঝরে পড়ছে সেই পাথরখানির উপরে। অবশেষে একসময় দুগ্ধধারা স্তব্ধ হয়। গাইটাও ফিরে চলে বনের বাইরে। বৈজু একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

গরুটা চলে গেলে সে ছুটে আসে সেই পাথরখানির পাশে। তার

ভুল ভাঙে—যেমন তেমন পাথর নয়, একখানি শিবলিঙ্গ। বৈজু হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে সেই শিবলিঙ্গের সামনে। করজোড়ে বলে —দেবাদিদেব। না জেনে গরুটাকে গালমন্দ করে আমি মহাপাতক হয়েছি। তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর। আমাকে দেখা দাও।

কিন্তু কোথায় শিব! কোন সাড়া জাগে না বনের বুকে, কোন পরিবর্তন হয় না শিবলিঙ্গের। সে যেমন অচল ও অটল ছিল, তেমনি থাকে। কেবল বৈজুর ব্যাকুল প্রার্থনা প্রতিধ্বনিত হয়ে গহন বনের বাতাসকে ব্যাকুল করে তোলে। বৈজু হতাশ হয়। ভাবে সে অব্রাহ্মণ বলেই দেবতা তার ডাকে সাড়া দিলেন না। দেবতার আচরণে বৈজু ক্রুদ্ধ হয়। প্রতিজ্ঞা করে, প্রতিদিন এই শিবলিঙ্গকে প্রহার না করে সে অন্ন গ্রহণ করবে না।

পরদিন থেকেই বৈজুর প্রতিজ্ঞা পালন শুরু হয়। গরু চরাতে এসে সেই শিবলিঙ্গকে তার লাঠি দিয়ে আঘাত করে তারপর আহার্য গ্রহণ করে। দিন কাটে কিন্তু বৈজুর এই নিত্যকর্মের কোন পরিবর্তন হয় না।

কিছুকাল পরে বৈজু একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেদিন সে আর গরু চরাতে যায় নি কিন্তু খেতে বসেই তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। খাবার থালা ফেলে রেখে সে উঠে দাঁড়ায়। দুর্বল দেহে লাঠি ভর করে এগিয়ে চলে গ্রামের প্রান্তে—বনের পথে। কম্পিত পায়ে কোনমতে এসে পৌঁছয় শিবলিঙ্গের সামনে। সজোরে আঘাত করে সেই পাষাণ দেবতাকে। দুর্বল শরীরে টাল সামলাতে পারে না। পড়ে যায় শিবলিঙ্গের পাদদেশে।

পাষাণ বিগলিত হয়—সত্য সুন্দর শিব আবির্ভূত হন সত্যাশ্রয়ী বৈজুর সামনে। তৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—ধন্য তোমার সত্যনিষ্ঠা। ব্রাহ্মণরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু তুমি অব্রাহ্মণ হয়েও প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করেছো। আমার এই অবস্থান ক্ষেত্র আজ থেকে পুণ্যধামে পরিণত হল। আর এই পুণ্যক্ষেত্রের নামের সঙ্গে তুমিও পুণ্যার্থীদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

বৈজু ভীলের নাম থেকেই নাম হয়েছিল বৈজুনাথ—এখন আমরা বলি বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথ ধাম। বৈদ্যনাথ মন্দিরের পশ্চিমে কিছু দূরে বৈজুর সমাধিক্ষেত্র, লোকে বলে বৈজু মন্দির। দোল পূর্ণিমার দিনে, মেলা বসে সেখানে। দোল-মঞ্চে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব হয়। বৈষ্ণব উৎসবের মধ্য দিয়ে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিপূজা করা হয়। সমন্বয়ই যে ভারতের ধর্ম।

বৈদ্যনাথ ধামের সরকারী নাম দেওঘর। দেওঘর শব্দের অর্থ দেবতার আলয়।

দেওঘর সাঁওতাল পরগণা জেলার একটি মহকুমা শহর। মহকুমার আয়তন ৯৫১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ছ' লক্ষ। শহরের স্থায়ী জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। তবে এই সংখ্যা দেওঘরের জনসংখ্যা নয়। প্রতি বছর লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী এই পুণ্যতীর্থে আসেন। বাসন্তী পঞ্চমী (জানুয়ারী), শিবরাত্রি (মার্চ) ও ভাদ্র পূর্ণিমার (সেপ্টেম্বর) সময় সবচেয়ে বেশি যাত্রী আসেন।

তীর্থে এলেও আমি তীর্থযাত্রী নই। তাই আমি অসময়ে দেওঘর এসেছি। গিরিডি থেকে মধুপুর এসে সেখান থেকে রেলে চেপে জসিডি হয়ে একটু আগে বৈদ্যনাথ ধামে পদার্পণ করেছি।

কলকাতা থেকে বৈদ্যনাথ ধাম আসতে হলে জসিডি জংসনে ট্রেন বদল করতে হয়। জসিডি থেকে বৈদ্যনাথ ধাম পৌণে চার মাইল—রেলে যোল-সতের মিনিট সময় লাগে। প্রতিদিন দশখানি করে গাড়ি যাওয়া-আসা করে। কলকাতা থেকে জসিডি আসার বহু ট্রেন আছে। তবে সময় বাঁচিয়ে আসার সহজ গাড়ি ৩৯ আপ হাওড়া-দিল্লী জনতা এক্সপ্রেস অথবা ১৯ আপ হাওড়া মিথিলা এক্সপ্রেস। রাতে হাওড়া থেকে ছেড়ে শেষ রাতে জসিডি পৌছয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যনাথ ধামের গাড়ি আছে।

এই সংক্ষিপ্ত পথটুকু বড়ই সুন্দর। দুদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সমতল ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে

খাপ খাইয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় নয়নাভিরাম বাংলো। কলকাতা থেকে বৈদ্যনাথ ধাম ১৯৮ মাইল।

দেওঘরের চারিদিকে সুস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা। শহরের মধ্যেও নন্দন পাহাড় নামে একটি ছোট্ট পাহাড় আছে। কিন্তু দেওঘর শৈলাবাস নয়—সমুদ্র সমতা থেকে মাত্র ৮৭৪ ফুট উঁচু। অতীতে কেবল তীর্থ হিসেবেই দেওঘরের খ্যাতি ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেও দেওঘর খ্যাতিলাভ করে।

১৮৭৯ সালে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু শেষ জীবনে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এখানে এসে বাস করতে থাকেন। তারপর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এখানে একটি আশ্রম তৈরি করেন। ফলে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে দেওঘরের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং সন্তোষের রাণী দীনমণি চৌধুরাণী এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত করেন। ১৯৩৩ সালে দেওঘরের জনসংখ্যা ছিল ন'হাজার। বলা বাহুল্য দেওঘর তখন বঙ্গদেশ।

অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক ভাবেই স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে দেওঘরের প্রসিদ্ধি এখন অনেক কমে গেছে। তবু যদি কোন কলকাতাবাসী কয়েকদিন এসে দেওঘরে বাস করে যান, নিঃসন্দেহে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

ছোট স্টেশন দেওঘর। জসিডি থেকে অনেকে বাসে করেও এখানে আসেন।

থলিটি কাঁধে নিয়ে আমি স্টেশনের বাইরে আসি। রিক্শা ও টাঙ্গাওয়ালারা ছেঁকে ধরল আমাকে। এখন প্রচুর সাইকেল রিক্শা হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টাঙ্গাওয়ালারা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। অথচ কিছুকাল আগেও টাঙ্গাই দেওঘরের একমাত্র বাহন ছিল।

স্টেশন থেকে এগিয়ে এসেই বাঁদিকে দেওঘরের প্রাণকেন্দ্র দুধ-ওয়ালা নির্মিত ঘড়িঘর। পূর্বদিকের রাস্তাটি গেছে বাজারে। বাজারের পাশ দিয়েই মন্দিরের পথ। মন্দিরের উত্তরে শিবগঙ্গা।

ঘণ্টাঘরের দক্ষিণ দিকে বিহারীলাল চক্রবর্তী রোড, গিয়ে মিশেছে

জালান রোডে। বাঁ দিকে গেলে ক্যাস্টর টাউন এবং ডান দিকে উইলিয়াম ও বম্পাস টাউন। রাস্তাটি মাঠের ধারে যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানেই দেব সংঘের নতুন মন্দির—ভারী সুন্দর।

এখানেই শহরের শেষ। শুরু হয়েছে উঁচু নীচু রুক্ষ প্রান্তর। এই প্রান্তরের বুক চিরে সরু একটি পিচ-ঢালা পথ চলে গেছে গুরুকুল পর্যন্ত। পথটি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। এই পথের পাশেই জালান পার্ক। পার্কের অজস্র ফুল পথচারীদের আহ্বান করে। দোলনা ও একটি পুকুর রয়েছে পার্কে। শান্ত ও নির্জন পরিবেশ। এখান থেকে মাঠ ভেঙে ধারোয়া নদীর তীর পর্যন্ত যাওয়া যায়। ন'লাখ টাকা নাকি খরচ হয়েছে এই মন্দির তৈরি করতে। এই মন্দিরের কাছেই বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম।

জালান পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যুগল মন্দির। আরও দক্ষিণে এগিয়ে গেলে ডানদিকে কুণ্ডেশ্বরের মন্দির ও বাঁদিকে তপোবনের পথ। শহর থেকে চার মাইল। এর সর্বোচ্চ স্থানে একটি শিবমন্দির ও শূলকুণ্ড আছে। স্থানীয়রা একে বাল্মীকির তপোবন বলেন।

ঘড়ি ঘরের পশ্চিম দিকে রোহিনী রোড—বিলাসী টাউন হয়ে চলে গেছে নন্দন পাহাড়ের দিকে। এই দিকেই রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ও অনুকুল ঠাকুরের আশ্রম। নন্দন পাহাড়ের ওপর ছিন্নমস্তাদেবীর মন্দির ও পাদদেশে কালীমন্দির।

রিক্‌শাওয়ালাদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে থলি কাঁধে এগিয়ে চলি বৈদ্যনাথ মন্দিরের দিকে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এই মহামন্দিরে। একান্ন পীঠের অন্যতম বৈদ্যনাথ ধাম— 'হৃদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ দেবতা জয় দুর্গাখ্যা।'

কিন্তু কোথায় এই বৈদ্যনাথ ?

মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গাবাদ জেলার পরানি গ্রামে পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল এক বৈদ্যনাথ মন্দির আছে। পাঞ্জাবের কিরাগ্রাম ও গুজরাতের দাভয় গ্রামেও বৈদ্যনাথের মন্দির আছে। তিনটি স্থানের

পাণ্ডারাই তাঁদের বৈদ্যনাথকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি বলে দাবি করে থাকেন। কিন্তু শিব পুরাণ ও বৃহৎ ধর্ম পুরাণের মতে দেওঘরই প্রকৃত বৈদ্যনাথ ধাম।

স্বর্ণলঙ্কাকে অজেয় করে তোলার মানসে রাবণ গেলেন কৈলাসে। দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় ব্রতী হলেন। তপস্যাতুষ্ট শিব সানন্দে রাবণকে তাঁর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি মহালিঙ্গ দান করলেন। বললেন—এই মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে লঙ্কা অজেয় হবে। কিন্তু পথে একে কোথাও মাটিতে নামিয়ে রাখা চলবে না। রাখলে সেখানেই মহালিঙ্গ চিরস্থায়ী হবে।

মহানন্দে রাবণ মহালিঙ্গ কাঁধে নিয়ে দেশে ফিরে চললেন।

এদিকে দেবতারা দেবাদিদেবের বদান্যতায় বিচলিত হলেন। জ্যোতির্লিঙ্গ লঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত হলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল রাবণের করতলগত হবে। তাঁরা জলাধিপতি বরুণের শরণাগত হলেন।

সব শুনে বরুণ অদৃশ্যভাবে রাবণের উদরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দশাননের প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হল। এমনি সময় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাবণের সামনে উপস্থিত হলেন। রাবণ তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য জ্যোতির্লিঙ্গ ধারণ করার অনুরোধ করলেন। ব্রাহ্মণ সম্মত হলেন।

কিন্তু রাবণ ফিরে এসে দেখেন ব্রাহ্মণ নেই, জ্যোতির্লিঙ্গ মাটিতে প্রোথিত। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি লিঙ্গকে তুলতে পারলেন না। তখন তিনি মহাদেবের উদ্দেশে অনেক অনুনয় করলেন। কিন্তু মহালিঙ্গ অচল রইল। ক্রুদ্ধ রাবণ লিঙ্গকে আঘাত করলেন। কোন ফল হল না। কেবল লিঙ্গের উপরিভাগের একটু অংশ স্থানচ্যুত হল।

অবশেষে ব্যর্থ রাবণ বুঝতে পারলেন জ্যোতির্লিঙ্গকে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়া তাঁর সাধ্যাতীত। তিনি তখন পদাঘাতে সেখানে একটি সরোবর খনন করলেন। বিশ্বের সমস্ত পুণ্যতীর্থ থেকে পুণ্যবারি এনে সেই সরোবরে সঞ্চয় করলেন। শিবগঙ্গা বা দেওঘরের মানস-সরোবরই নাকি রাবণের সেই সরোবর।

ইতিহাস অবশ্য বলে, সম্রাট আকবরের সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ এই জলাশয় খনন করিয়েছেন, আর তার নাম অনুসারেই শিবগঙ্গার অপর নাম মানস-সরোবর।

মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছতেই যথারীতি পাণ্ডার দল খাতা নিয়ে আমাকে আক্রমণ করলেন। এখানে সাড়ে তিনশ' পাণ্ডা পরিবার আছেন। এরা সকলেই মৈথিলী ব্রাহ্মণ। আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি বরুণ পাণ্ডার নাম করি। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীরা পশ্চাদপসরণ করেন। শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে মন্দির পর্যন্ত সর্বত্রই একটা ট্রেড এথিক্স বা প্রফেশনাল এটিকেট্ আছে।

মন্দিরের সামনে পুজোর বাজার বসেছে। আতপ-চাল ঘি বেলপাতা দুধ কলা পেঁড়া গঙ্গাজল ও ধুতরো ফুল অর্থাৎ শিবপ্রিয় যাবতীয় উপচার এখানে পাওয়া যায়। শিবচতুর্দশীর সময় এখানে বিরাট মেলা বসে। যারা নিয়মানুযায়ী পুজো দিতে চান, তাঁদের প্রথমেই শিবগঙ্গায় গিয়ে স্নান ও তর্পণ করতে হয়। তারপর মন্দির চত্বরে এসে জল কিনতে হয়। কারণ কীর্তিনাশা রাবণ কর্তৃক খনিত বলে শিবগঙ্গার জলে পুজো হয় না। মন্দির প্রাঙ্গণে চন্দ্রকূপ নামে একটি কুয়ো আছে। এই কুয়োর জল ছাড়া পুজো হয় না। পুণ্যার্থী-দের তাই সেই পবিত্র কূপবারি কিনতে হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকে গঙ্গোত্রী গোমুখী বা মানস-সরোবর (কৈলাস) থেকে পুণ্যবারি এনে মহালিঙ্গকে স্নান করান।

উপকরণ সংগ্রহ করে পুণ্যার্থীরা সিক্ত বসনে মন্দিরে প্রবেশ করেন। ষোড়শ বা পঞ্চ উপচারে মহাদেবের পুজো করতে হয়। সাধ্যানুসারে যাত্রীরা রুপোর টাকা বা গিনি প্রণামী দেন। ধনীরা অনেকে বাবা বিশ্বনাথের চরণে স্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত সমর্পণ করেন। একশ' বছর আগেও মন্দিরের বাৎসরিক আয় ছিল দেড় লক্ষ টাকা।

আগে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতই এই মন্দির পরিচালনা করতেন। পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রধান পুরোহিত এবং আরও

কয়েকজন মিলে একটি বোর্ড অব ম্যানেজমেণ্ট গঠন করেন। এরা বহুকাল মন্দির পরিচালনা করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে সরকারী হস্তক্ষেপে একটি কাউন্সিল অব ট্রাস্টিজ গঠিত হয়েছে। তাঁরাই এখন মন্দির পরিচালনা করেন।

আগে এ মন্দিরে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। বছর বিশেক হল বৈদ্যনাথ মন্দির হরিজনদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে।

নানাবিধ কারুকার্য সমন্বিত পাথরের শিবমন্দির। রেখ দেউলের মতো ৭২ ফুট উঁচু মন্দিরশীর্ষ। গিধৌর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরণ মল ১৫৯৬ সালে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মুসলমান আমলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বীরভূমের রাজাকে কর দিতেন।

মন্দিরের সামনে প্রশস্ত আঙ্গিনার চারিদিকে একুশটি ছোট ছোট মন্দির—হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ, সাবিত্রী (তারা), পার্বতী, কালী, সরস্বতী, বগলা, অন্নপূর্ণা, সন্ধ্যা, মনসা, গঙ্গা, গৌরী, কার্তিক, ব্রহ্মা, নীলকণ্ঠ মহাদেব, গণেশ, সূর্য, আনন্দ ভৈরব, কাল-ভৈরব, রামচন্দ্র ও হনুমানের মন্দির। এদের গঠন নৈপুণ্যও তাকিয়ে দেখার মতো।

গৌরী মন্দিরটিই শক্তিপীঠ। মূল-মন্দিরের চারিদিকে খোলা বারান্দা। মনোবাসনা পূর্ণ হবার প্রত্যাশায় বহু নারী-পুরুষ হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন। গর্ভগৃহটি ছোট। মধ্যস্থলে রাবণেশ্বর শিব বা জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজিত। আকারে খুবই ছোট।

সকালে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয়। বেলা দুটো পর্যন্ত পুজার্চনা চলে। তারপরে মন্দিরদ্বার বন্দ হয়। সমস্ত মন্দির পরিষ্কার করার পরে সন্ধ্যার আগে আবার দরজা খোলে। শুরু হয় মহারতি—ঘণ্টা বাজে, কাঁসর বাজে। তালে তালে পূজারী আরতি করেন। যাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন—ধন্য হন।

মন্দির দর্শন করে এগিয়ে চলি শিবগঙ্গার দিকে। বিশাল জলাশয়—পরম পবিত্র জলাশয়। কিন্তু পবিত্র জলাশয়ে পুণ্যস্নান স্বাস্থ্যসম্মত কিনা, তা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে বিহার

বিধানসভায়। স্থানীয় শিক্ষিত জনসাধারণ এই জলাশয় সংস্কারের জন্য পুনরায় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন।

চারিদিকে বাঁধানো ঘাট? চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে শিবগঙ্গার জলে। বিজয়া দশমীর দিন এই জায়গাটি আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। দেওঘরের প্রায় সব দুর্গা প্রতিমাই এখানে বিসর্জিত হয়।

ঘাটের এককোণে এসে বসি। ভেবে চলি—জ্যোতির্লিঙ্গ এখানে প্রোথিত হবার পরে রাবণ আবার কৈলাসে ফিরে গেলেন। পুনরায় তপস্যা শুরু করলেন। নিজের ন'টি মাথা কেটে মহাদেবের উদ্দেশে অঞ্জলি দিলেন। তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অজেয় বর দান করলেন এবং মাথা নয়টিকে আবার শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন।

রাবণের সাফল্যে দেবতারা বিচলিত হলেন। তাঁরা দেবর্ষি নারদকে পাঠালেন রাবণের কাছে। নারদ তাঁকে বোঝালেন—যাই বলুন না কেন, দেবাদিদেব আপনার দিকে তেমন নজর দিচ্ছেন না। দিলে আপনি আরও শক্তি অর্জন করতে পারতেন।

রাবণ তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন। নারদ তখন রাবণকে পরামর্শ দিলেন—আপনি কৈলাস পর্বত ধরে নাড়া দিন, তাহলে আপনার দিকে মহাদেবের নির্ঘাত নজর পড়বে।

শক্তি মদে মত্ত রাবণ নারদের পরামর্শ মতো কৈলাস পর্বতকে নাড়াতে থাকলেন। মহাদেবের তপোভঙ্গ হল। হর-পার্বতী কৈলাস-শিখর থেকে রাবণের এই কীর্তি দেখলেন। গৌরী তখন পশুপতিকে উপহাস করে বললেন—তুমি অযোগ্যকে অজেয় শক্তি দান করেছ। ত্রিভুবন যে রসাতলে যাবে।

বিরক্ত রুদ্র তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে অভিশাপ দিলেন—দেবতাদের অজেয় হলেও অমর হবে না তুমি। মানুষের হাতে মৃত্যু হবে তোমার। ত্রেতাযুগে পৃথিবীতে সেই মহামানব জন্মগ্রহণ করবেন।

মহাদেবের এই অভিশাপের ফলেই সৃষ্ট হল জগতের প্রথম মহাকাব্য। দেবতার সামগীতি নয়, মানুষের জয়গান—রামায়ণ।

কজ্ এ্যাণ্ড এফেক্ট। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, সবই নাকি এই সূত্রে বাঁধা। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। হাত দেওয়া কজ, পুড়ে যাওয়া এফেক্ট। জগতের জ্ঞানী গুণী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নাকি এফেক্ট দেখলেই কজ আবিষ্কার করতে পারেন। আমি তাঁদের দলে নই। তবু ঐ একই তাড়নায় এসেছি এখানে—এই শিমুলতলায়।

এফেক্টের কথা শুনেছিলাম শিশিরদার মুখে। ও! আপনারা তো আবার শিশিরদাকে চেনেন না। বাহাত্তর বছরের প্রবীণ যুবা শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। হিমালয়ের তাবৎ তীর্থ পরিক্রমা শেষে যিনি শুশুনিয়ায় রক্ ক্লাইম্বিং ট্রেনিং নিয়েছেন। পারিবারিক জীবনে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। ব্যাবহারিক জীবনে এ্যাডভোকেট। এখনও নিয়মিত হাইকোর্টে যান।

শিশিরদার বাড়ি আছে শিমুলতলায়—বিন্দুবাসিনী কুটির। আমার এই পরিক্রমার কথা শুনে, বিশেষ করে আমি দেওঘর আসব শুনে, তিনি বলেছিলেন অন্তত একটা দিন এখানে কাটিয়ে যেতে। তাই একটু আগে দেওঘর থেকে এসেছি এখানে।

শিমুলতলা দেওঘর থেকে মোটে ১৭ মাইল, কলকাতা থেকে ২১০ মাইল। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন লাইনের ওপর অবস্থিত। কিন্তু কোন দ্রুতগামী ট্রেন এখানে থামে না। কাজেই প্রায় আট-নয় ঘণ্টা সময় লাগে। কলকাতা থেকে সকালে রওনা হয়ে বিকেলে, দুপুরে রওনা হয়ে রাতে অথবা রাতে রওনা হয়ে পরদিন সকালে শিমুলতলায় আসা যায়।

চারিদিকে শাল সেগুন আর মহুয়ায় ছাওয়া ছোট ছোট পাহাড়। তারই মাঝে এই প্রাচীন স্বাস্থ্যনিবাস। বালি কাঁকর ও লালমাটির

সাঁওতালী উপত্যকা। আপ ও ডাউন, দুটি প্ল্যাটফর্ম—উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত, আর একটি ওভারব্রিজ নিয়ে ছোট্ট স্টেশন। স্টেশনের দুদিকেই বাড়ি-ঘর। পশ্চিমাঞ্চলকে বলে 'হাউস অব্ কমন্স,' পূর্বাঞ্চলকে বলে 'হাউস অব্ লর্ডস'। ভারতের একমাত্র লর্ড, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের বাড়িটি কিন্তু হাউস অব কমন্সে। বাড়িটির নাম 'দি ডেন'।

স্টেশনের পুবে একটি শৈলশিরা শিমুলতলাকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করেছে। এই শৈলশিরাটির নাম 'দি রিজ্'। রিজের ওপরে কয়েকটি প্রাসাদসদৃশ বাড়ি। এটি হাউস অব লর্ডসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। এর মধ্যে লর্ড সিংহের বাড়ি নেই বটে। কিন্তু যাঁরা এখানে বাড়ি করেছেন, তাঁরা লর্ড না হয়েও লর্ডের মতই ছিলেন। এখানে বাড়ি আছে নলডাঙ্গার রাজার, ভবনাথ সেনের, স্যার আর. এন. মুখার্জির ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

রিজের নিচ থেকে শুরু করে স্টেশনসহ শিমুলতলার বাকি সমস্তটাই হাউস অব কমন্স। শিশিরদার বাড়িও এই অংশে। আমিও তাই হাউস অব কমন্সেরই অধিবাসী। লর্ডসদের যুগ গত হয়েছে। কমন্সরাই এ যুগের ভাগ্যবিধাতা। হাউস অব কমন্সে আসন পেলে কে আর এখন হাউস অব লর্ডসের দিকে নজর দেয়।

থলিটি পিঠে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে আসি পথে—পুরনো ঢাকাই রোডে। এগিয়ে চলি পশ্চিমে। কিছুদূর এসেই তেরাস্তার মোড়। আমি ডাইনের পথ ধরেছি। পথের দুদিকে বড় বড় বাড়ি। সবই প্রায় জরাজীর্ণ। তাহলেও তাদের গঠন-নৈপুণ্য বিস্ময়কর। সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। সে আমলে হয়ত ফুল-বাগান ছিল। এখানকার মাটিতে ফুল খুব ভাল হয়। বিশেষ করে গোলাপ চামেলী ও চন্দ্রমল্লিকা। ১৯২২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র পুস্তক থেকে জানা যায় সে আমলে কলকাতায় 'শিমুলতলা হইতে বৃহৎ চন্দ্রমল্লিকার আমদানী' হত।

সেদিনকার সেই কুসুম-কানন আজ কাঁকরময় রুক্ষ প্রান্তরে

পরিণত। তবে ইউক্যালিপটাস ও ঝাউগাছগুলো আজও তেমনি মাথা উঁচু করে আছে। মানুষের অনাদর ও অবহেলায় ওদের কিছুই যায় আসে না। ওরা মানুষের পরিচর্যায় প্রত্যাশী নয়। প্রকৃতি ওদের ধাত্রী। তাই ওরা আজও শিমুলতলার সেই গৌরবময় যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ভারতের আর কোথাও বছরের পর বছর ধরে এত বড় বড় বাড়ি এমন সংস্কারহীন অবস্থায় খালি পড়ে আছে বলে আমার জানা নেই। অথচ শিমুলতলার স্বাস্থ্যহানি ঘটে নি। আজও তার আকাশ তেমনি নীল বাতাস তেমনি নির্মল, জল তেমনি মিষ্টি আর মাটি তেমনি কুসুম-প্রসবিনী।

এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে দেওঘর। মানুষের ভিড়ে সেখানে আজ মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া ভার। মধুপুর গিরিডি ও ঝাঝাতেও প্রায় একই অবস্থা। তাহলে শিমুলতলা আজ পরিত্যক্ত কেন? কেন সে আজ মৃত-স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত? স্বাস্থ্যান্বেষীদের আজ শিমুলতলার প্রতি কেন এই বিকর্ষণ?

এই কেনর উত্তর খুঁজতেই আমি আজ এসেছি এখানে। হাউস অব কমন্‌সের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি উত্তরে। বাঁ দিকে একটি পথ চলে গেছে। আমি কিন্তু এগিয়ে চলি সামনে। আরও খানিকটা এসে বাঁ দিকে আরেকটি পথ। এই পথটি গিয়ে মিলেছে নতুন চাকাই রোডে। সেই মিলন বিন্দুতেই বিন্দুবাসিনী কুটির—শিশিরদার বাড়ি।

বুড়ো মালি আমারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির বাইরে। সে আমাকে চেনে না, তবু দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারে আমিই তার মেহমান। ছুটে কাছে আসে, কাঁধ থেকে থলিটা ছিনিয়ে নিয়ে পরম পরিচিতের মতো আমার কুশল জিজ্ঞেস করে। তারপরে পথ চলতে চলতে সামনের বাড়ির মালিকে জানিয়ে দেয়—আমি এসে গেছি।

যক্ষের মতো বিন্দুবাসিনী কুটির আগলে রয়েছে সে। মাইনে পাচ্ছে নিয়মিত। কিন্তু তবু সে দুঃখিত, তবু সে অতৃপ্ত, তবু সে

অভাবগ্রস্ত। মানুষের জন্যে কুটির, কিন্তু মানুষ নেই বিন্দুবাসিনী কুটিরে। তাই আজ আমার আগমনে সে আনন্দিত, উদ্বেলিত, গৌরবান্বিত। সগৌরবে নিজের সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। কত বিচিত্র রকমের অভাব আছে এ সংসারে।

ঘরদোর আগে থেকেই পরিষ্কার করে রেখেছে। মালি সামনের ঘরে আমার থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। কুয়ো থেকে জল তুলে বাথরুমে নিয়ে আসে। এ কাজটি মোটেই সহজ নয়। জল বহু নিচে। জলাভাব শিমুলতলার অবনতির অন্যতম কারণ।

চান করে ঘরে এসে বসতেই মালি চা নিয়ে হাজির হয়। থলি থেকে বিস্কুট বের করে চা খেতে খেতে মালির সঙ্গে গল্প শুরু করি। মানুষের গল্প নয়, মাটির গল্প। শিমুলতলার কথা···তার গৌরবোজ্জ্বল যৌবনের কাহিনী। বৃদ্ধ মালি বলে চলে, আমি কান পেতে শুনি—

সে প্রায় একশ' বছর আগের কথা। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক খনিজ সম্পদের সন্ধানে শিমুলতলায় আসেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমের একটি পাহাড়ে তিনি অভ্রের সন্ধান পান। তিনি তখন শৈলশিখরের ওপর একটি বাংলো তৈরি করে এখানে বাস করতে থাকেন। তিনিই শিমুলতলার প্রথম বহিরাগত বাসিন্দা। তারপর তিনি যন্ত্রপাতি এনে স্থানীয় সাঁওতালদের সাহায্যে অভ্র উত্তোলন আরম্ভ করেন। শিমুলতলা সমৃদ্ধতর হতে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কিছুকাল পরে অভ্র নিঃশেষ হলে তিনি শিমুলতলা পরিত্যাগ করেন। যাবার সময় তেলুয়ার জমিদার ঠাকুরদের কাছে তাঁর বাংলোটি বিক্রি করে দিয়ে যান।

অভ্র নিঃশেষ হলেও শিমুলতলা মানুষের মন থেকে মুছে যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে শিমুলতলার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দেওঘর ও মধুপুর থেকে এখানে চড়ুইভাতি করতে আসতেন। এই সময় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাসেসর বিষ্ণুচরণ দে মাঝে মাঝে দেওঘর থেকে শিমুলতলায় বেড়াতে আসতেন।

ক্রমে শিমুলতলার ওপর তাঁর একটা মায়া পড়ে যায়। ১৮৯২ সালে তিনি সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের বাংলোর পাশে একটি বাড়ি তৈরি করান। এটিই শিমুলতলার প্রথম স্বাস্থ্যাবাস।

১৮৯৪ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলুয়ার ঠাকুরদের কাছ থেকে সেই বাংলোটি কিনে নেন এবং মাঝে মাঝে এখানে এসে অবকাশ যাপন করতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন বাংলাদেশের সুধী-সমাজের নজর পড়ে শিমুলতলার দিকে। একে একে বিহারীলাল গুপ্ত আই. সি. এস. (যাঁর ছোটলাট হবার কথা হয়েছিল), স্যার আর. এন. মুখার্জি (মার্টিন বার্ন), ভবনাথ সেন, নরেন্দ্রচন্দ্র বসু, নগেন্দ্রচন্দ্র পালিত, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এখানে বাড়ি তৈরি করান। তাই বিগত শতাব্দীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনকাহিনীর সঙ্গে শিমুলতলার নাম অচ্ছেদ্য হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুজো ও বড়দিনের সময় শিমুলতলার আকাশে উৎসবের পরশ লাগত, বাতাসে যৌবনের সাড়া জাগত, মাটি মানুষের হাসিতে ভরে উঠত। পাহাড়ের বুকে আর সাঁওতালী গাঁয়ে, উন্মুক্ত কাঁকরময় প্রান্তরে আর নীলাবরণ নদীর তীরে, শাল-সেগুনের বনে আর বাজারের দোকানে-দোকানে সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হত; দূর গাঁয়ের সাঁওতালরা চাল-ডাল, তরি-তরকারি, মাছ-মাংস, ডিম-দুধ, তেল ও ঘি নিয়ে আসত বাজারে কিংবা বাংলোয়। তেলুয়ার শিবু কড়া ও নরম পাকের সন্দেশ ফিরি করত বাড়িতে বাড়িতে।

আমার মনে পড়ে, এই তো সেদিনকার কথা—পুজোর সময় বন্ধুরা এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা দেখে গেছেন বিখ্যাত চিত্র প্রযোজক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাধুমধাম করে এখানে দুর্গাপুজা করছেন, বিনে পয়সায় সিনেমা দেখাচ্ছেন ও সাঁওতালদের পেট ভরে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন। নিউ থিয়েটার্সের গৌরবময় যুগে এটি শ্রী সরকারের বাৎসরিক ব্রত ছিল।

জিনিসপত্র আগে খুবই সস্তা ছিল এখানে। মালি বলে চলে—

গত যুদ্ধের ঠিক আগে, আমি টাকায় একুশ সের দুধ নিয়েছি, চোদ্দ আনা সেরে খাঁটি গাওয়া ঘি কিনেছি।

'হায় রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল!'

মধুপুর ও দেওঘরে ভিড় হয়ে যাওয়ায় শান্তিপ্রিয় স্বাস্থ্যান্বেষীরা শান্ত ও সুন্দর শিমুলতলায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন দেশগৌরব মনীষীরা। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে তাঁদের পদধূলিতে শিমুলতলার পথ ধন্য হত। তাঁদের সঙ্গলাভের আশায় দলে দলে সাধারণ মানুষ এসেও এখানে ঠাঁই নিলেন। সেই সঙ্গে এলেন তৎকালীন বাংলাদেশের বণিক সম্প্রদায়--বিরাট বিরাট বাগানবাড়ি তৈরি হল। শিমুলতলা ধনে ও জনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার দেহে যৌবনের বান ডাকল। কিন্তু এ যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই তার বার্ধক্য ঘনিয়ে এল, অকাল মৃত্যু হল।

কিন্তু কেন? আজও তো পাহাড় তেমনি সবুজ, নীলাবরণ নদী তেমনি লাস্যময়ী, শাল-সেগুনের বন তেমনি প্রশান্ত। তাহলে কেন শিমুলতলার এই অকাল মৃত্যু?

ভাগ্য পরিবর্তনশীল। মানুষ পরিবর্তনশীল। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনের পরিবর্তন ঘটে। সেই সঙ্গে মানুষের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদও পরিবর্তিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী ছিলেন অল্পতে তুষ্ট। তাঁরা পশ্চিমের নাম করে আসতেন তোপচাঁচি, পরেশনাথ, হাজারিবাগ, দেওঘর ও শিমুলতলা, বড় জোর গয়া কিংবা কাশী। তাঁদের উদ্দেশ্য বিফল হত না। তাঁরা পুণ্যসঞ্চয় করতেন, স্বাস্থ্য উদ্ধার করতেন। সেকালে ছিল, 'চেন্‌জ ফর চেন্‌জেস সেক্'—বায়ু পরিবর্তনের জন্যই বায়ু পরিবর্তন। এখন বায়ু পরিবর্তন দূর দেশে পাড়ি দেবার একটা প্রতিযোগিতায় পরিণত। আমি এমন কয়েকজনকে জানি যাঁরা পুজোর ছুটিতে ইউরোপ কিংবা আমেরিকা থেকে বেড়িয়ে আসেন। করেন এক্সচেন্‌জ? যোগ্যতা থাকলে যোগাড় হয়ে যায়। কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট

ব্যবহারজীবীর সঙ্গে আমার একবার পহেলগাঁয়ে পরিচয় হয়েছিল। তিনি প্রতিবার পুজোর ছুটিতে সপরিবারে কাশ্মীর যান। অথচ তিনি ভারতের অধিকাংশ দর্শনীয় স্থান দর্শন করেন নি।

সেকালে যাঁরা শিমুলতলার শান্ত সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে এই সব অতিকায় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাদেরই বংশধরদের শিমুলতলা আর আকর্ষণ করতে পারে নি। এর কারণ মানুষের জীবনযাত্রা জটিলতর হয়েছে। সমস্যাসঙ্কুল জীবনের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে অনেকেই এখন আর ঘন ঘন কলকাতা বা কর্মস্থলের বাইরে বেরুবার অবকাশ পান না। যখন সুযোগ আসে, তখন তাঁরা পাড়ি জমান কন্যাকুমারী কাশ্মীর, দিল্লী সিমলা, মুসৌরী নৈনিতাল, গোয়া বম্বে। কি দরকার সারা বছর মালি পোষার, বাড়ি সারাবার? এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় জরাজীর্ণ বাড়ির পেছনে মেহনতের মুনাফা বিসর্জন দেবার? তাই এখানে বাড়ি আছে বাসিন্দা নেই, বাগান আছে মালি নেই, স্টেশন আছে যাত্রী নেই।

অথচ ঠিক এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। যেমন হয় নি মধুপুর ও দেওঘরে। তেলুয়ার ঠাকুররা সেকালের শিমুলতলার মালিক ছিলেন। পরে ঋণের দায়ে তাঁরা গিধৌর মহারাজাকে শিমুলতলার অর্ধেক লিখে দেন। এখন জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে। কাজেই শিমুলতলা জাতীয় সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু দুঃখের কথা শিমুলতলার উন্নয়ন ব্যাপারে, সরকার বড়ই উদাসীন।

গত বিশ-পঁচিশ বছরে এখানকার রাস্তাঘাটের কোন সংস্কার সাধন করা হয় নি। তার ওপর রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা—কোন দ্রুতগামী ট্রেন শিমুলতলায় থামে না। কলকাতা থেকে এই দু'শ দশ মাইল আসতে আট-ন ঘণ্টা সময় লাগে। আগে প্রত্যেক ডাউন গাড়িকেই এখানে থামতে হত। ঝাঝা থেকে শিমুলতলার উচ্চতা বেশি। সে আমলে একটি ইনজিনের পক্ষে এই চড়াই পথ অতিক্রম করা সম্ভব হত না। তাই ঝাঝা থেকে গাড়ির পেছনে একটি পায়লট

ইনজিন জুড়ে ঠেলে তোলা হত। পায়লট ইনজিনকে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনে প্রত্যেক গাড়ি এখানে থামত। আধুনিক ইনজিন অনেক শক্তিশালী—এখন আর পায়লট ইনজিনের দরকার পড়ে না। ফলে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে শিমুলতলার মূল্য শেষ হয়ে গেছে। অথচ স্যানাটোরিয়াম স্টেশন হবার সকল যোগ্যতাই শিমুল-তলার আছে।

অনেকে বলবেন, এখন আর শিমুলতলায় আগের মতো খাবার-দাবার পাওয়া যায় না। কোথায় বা যায়? অন্ন সংকট তো সর্বত্র। কিন্তু এখনও শিমুলতলায় দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট বসে। খদ্দের বাড়লে আমদানীও বাড়বে এবং দাম নিঃসন্দেহে যে কোন শৈলাবাস বা সমুদ্রপুরী থেকে বেশি হবে না। সরকারী উদাসীনতাই শিমুলতলার অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ।

শুধু শিমুলতলা নয়, সরকারী অবজ্ঞার ফলে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলও ক্রমেই জনহীন ও দরিদ্রতর হয়ে পড়েছে। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও অসংখ্য মেহনতী মানুষের নিবাস হওয়া সত্ত্বেও শিমুলতলার কাছাকাছি কোন কলকারখানা নির্মিত হয় নি। ফলে বেশি রোজ-গারের আশায় স্থানীয় সাঁওতালরা চলে যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন রাঁচি কিংবা বোকারোতে। একদিকে লোকাভাবে এখানকার ক্ষেতখামারে চাষাবাদ হচ্ছে না। আর একদিকে কারখানার কাজে সাঁওতালদের শরীর টিকছে না। কিছুকাল পরে অসুস্থ হয়ে তারা ফিরে আসছে গাঁয়ে—অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ট্যুরিস্ট দপ্তরের কথা ছেড়েই দিলাম, সমাজ উন্নয়ন দপ্তরেরও শিমুলতলার উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কয়েক বছর আগে কাগজে দেখেছিলাম, আড়িয়াদহের এক সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য একটি অবসর ভবন নির্মাণ করবেন শিমুলতলায়। এজন্য একটি বাড়ি ও মন্দিরসহ পঁচিশ বিঘা জমি তাঁরা পেয়েছেন এখানে। কয়েক লক্ষ টাকাও সংগ্রহ করেছেন। সরকারী

সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেছে। যে-সব নিরাশ্রয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বয়স ষাটের ওপরে, তাঁরাই আশ্রয় পাবেন এই ভবনে। সরকারী উদ্যোগে তো হল না, তবু যদি বে-সরকারী উদ্যোগে কিছু হয় শিমুল-তলার। উদ্যোক্তাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে মালির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি পথে। লাটু ছাতি ন্যাড়া ও বাঘোয়া পাহাড় দর্শন করি। বাঘোয়া পাহাড়ে সুন্দর সুন্দর ঝরণা আছে। ন্যাড়া পাহাড় থেকেই জঙ্গল শুরু। ছাতি পাহাড় ছাড়িয়ে ঝাঝার পথেও ঘন জঙ্গল।

নীলাবরণ নদী আর হরদিয়া ঝরণার পাশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। অপূর্ব সুন্দর এই নদী ও ঝরণা। এখনও দেওঘর ও মধুপুর থেকে অনেকে এখানে চড়ুইভাতি করতে আসেন। কিন্তু বিহার সরকারের ট্যুরিস্ট বুরোর খাতায় এঁদের নাম লেখা নেই।

স্টেশনের কাছেই পশুপতিনাথের ছোট মন্দির ও ধর্মশালা। ধর্মশালা কিন্তু দূরাগত পুণ্যার্থীদের অস্থায়ী আশ্রয় নয়, স্থানীয় অধিবাসীদের স্থায়ী আবাস। তারা ধর্মশালাকে জবরদখল কলোনীতে পরিণত করেছেন।

স্টেশনের মাইল দুয়েক দূরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ নামে একটি আশ্রম আছে। আশ্রমবাসীরা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত।

সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে স্বাভাবিকভাবেই হাজারিবাগ ও বাঁকুড়ার মতো এ অঞ্চলেও মিশনারীরা এসেছিলেন। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে চাকাইয়ের কাছে বামদা গ্রামে তাঁরা একটি গীর্জা নির্মাণ করেন। সেই গীর্জাটি এখনও আছে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য অঞ্চলের মতো মিশনারীরা এ অঞ্চলে শিক্ষার দিকে তেমন নজর দেন নি। কাজেই একটিমাত্র প্রাইমারী স্কুল ছাড়া শিমুলতলায় আর কোন শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে নি। ইদানীং অবশ্য

তেলুয়াতে একটি হাই স্কুল হয়েছে, কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ ছাত্র স্থানীয় অধিবাসী নয়। ব্যবসার প্রয়োজনে যে সব মারোয়াড়ী ও বিহারী এখানে স্থায়ী হয়েছেন, তাঁদের ছেলেরাই সেখানে পড়ে। কলেজে পড়তে হলে ঝাঝা কিংবা দেওঘরে যেতে হয়।

মিশনারীরা শিক্ষার দিক থেকে শিমুলতলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করেন নি সত্য, কিন্তু তাঁরা বামদাকে মানব-সেবার একটি আদর্শক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। বামদার হাসপাতাল চক্ষু চিকিৎসার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

শিমুলতলায় কোন হাসপাতাল নেই। তবে একটি চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। শিমুলতলার সেই স্বর্ণযুগে জনসাধারণের পয়সায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে ডাক্তার অবিনাশ রায়চৌধুরী এই ডিস্‌পেন্‌সারীব প্রথম চিকিৎসক হয়ে এসেছিলেন। ডাক্তার এখনও একজন আছেন, তবে ডিস্‌পেন্‌সারীর বড়ই জীর্ণদশা।

সন্ধ্যের একটু পরে ফিরে আসি বিন্দুবাসিনী কুটিরে। মালি তাড়াতাড়ি উনোন ধরায়। সে দুপুরেই রাতের রান্না করে রেখেছিল। শুধু সেগুলো একটু গরম করে নিয়ে ক'খানা রুটি বানিয়ে ফেলে। তারপরে পরম যত্নে আমাকে খেতে দেয় আর বলতে থাকে আজকের রাতটাও এখানে থেকে যেতে।

কিন্তু তার সে আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করে আমি থলিটি পিঠে নিয়ে টর্চ হাতে স্টেশনের দিকে রওনা হই। শিমুলতলার মায়া কাটিয়ে ফিরে যেতে হবে কলকাতায় জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে।

স্বল্প অবসরে সীমিত ব্যয়ে যে সাপ্তাহিক পরিক্রমা শুরু করেছিলাম, আজ তা পূর্ণ হল। তবু আমার মন এত অশান্ত কেন? তবে কি মালির ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে? কিন্তু ওর সঙ্গে তো মোটে দেড় দিনের পরিচয়। ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে ব্যথা পেয়েছি সত্য, তাই বলে ওর জন্য আমার মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি।

মালি নয়, মাটি—শিমুলতলাই আমাকে আকর্ষণ করছে। শিমুলতলা এ যুগের অনেক অবজ্ঞা নীরবে সয়েছে, তাই মানুষের অবজ্ঞায় সে আর বিচলিত হয় না। কিন্তু যাকে কেউ ভালবাসে না, সে যদি কারো কাছ থেকে অযাচিত ভালোবাসা পায়, তাহলে বড় বিচলিত হয়ে পড়ে। সেই ভালোবাসার জনটিকে বিদায় দিতে তার বড়ই ব্যথা বাজে। আমার সমবেদনায় ও ভালোবাসায় শিমুলতলা আজ তাই এমন বিচলিত। বার বার আমার কানে কানে করুণ কণ্ঠে বলছে—যেতে নাহি দিব।

কিন্তু আমি যে পথিক—সকল কালের, সকল পথের পথিক। সবুজ পাহাড় আর ইউক্যালিপ্টাসের মর্মর নিমন্ত্রণ, নির্মল আকাশ আর মুক্ত বাতাসের আকুল আবাহন উপেক্ষা করে আমি এগিয়ে চলি —দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জীবন থেকে মহা-জীবনের পথে।

নেতারহাট

রাজা-রাণীর যুগ গত হয়েছে আড়াই যুগ আগে। সেই সঙ্গে চিরকালের মতো ভেঙে গেছে বৌঠাকুরাণীর হাট। এখন নেতারাই দেশের রাজা। তাই অনেকে হয়তো ভাবছেন, সেকালে যেমন বৌঠাকুরাণীর হাট বসতো, একালে তেমনি নিশ্চয়ই কোথাও নেতাদের হাট বসে। আর আমি আজ সেই নেতারহাটের কথাই বলতে বসেছি।

সবিনয়ে নিবেদন করছি, আপনাদের অনুমান সত্য নয়। এ যুগে নেতাদের হাট বসে বৈ কি, কিন্তু সে হাটের সংবাদ সরবরাহ করার যোগ্যতা আমার কোথায়? আমি নেতাহীন নেতারহাটের কথা বলতে চাইছি।

নেতারহাট বিহারের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। শুধু স্বাস্থ্যকর নয়, সুন্দরও বটে। ট্যুরিস্ট বিভাগের ভাষায়—'বিউটি কুইন অব্ বিহার' এবং 'কাশ্মীর অব্ বিহার'। দ্বিতীয় উপমাটি কার মস্তিষ্ক-প্রসূত জানি না, তবে তিনি যে কাশ্মীর দর্শন করেন নি, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভাল খারাপের প্রশ্ন উত্থাপন না করে, কেবল প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা ভেবেই বলা চলে, উপমাটি বেমানান।

তবে নেতারহাট সত্যই বিহারের 'বিউটি কুইন'। যারা সুন্দরকে ভালোবাসেন। তাঁরা নেতারহাট গেলে আনন্দ পাবেন—আমিও পেয়েছি। আর আপনাদের সেই আনন্দের অংশীদার করার বাসনা নিয়েই আমি আজ নেতারহাটের কথা বলতে বসেছি।

কিন্তু এমন সুন্দর স্থানের নাম নেতারহাট হল কেন? এ সম্পর্কে দুটি জনশ্রুতি আছে। একদল বলেন—স্থানীয় ভাষায় নেতা শব্দের অর্থ বাঁশ। আগে এখানে প্রচুর বাঁশবন ছিল (এখনও

কোন কোন অংশে আছে) বলে এখানকার নাম হয়েছে নেতা বা বাঁশের হাট। আর একদল বলেন—নেতা শব্দটি নেত্র শব্দের অপভ্রংশ। নেত্র মনুষ্যদেহের সুন্দরতম অংশ। এই স্থানটি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলে, এর নাম হয়েছে নেতা বা সৌন্দর্যের হাট। আমিও তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে বলব, সার্থক নাম নেতারহাট। সত্যই সে অপরূপ রূপের আলয়।

বহুদিন ধরে বহুজনের কাছে শুনে আসছিলাম সেই সৌন্দর্যের কথা। বহুকাল থেকেই সে আমাকে আকর্ষণ করছিল। তাই অবশেষে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে, এক শনিবারের সন্ধ্যায় ঝোলা কাঁধে, হাজির হলাম হাওড়া স্টেশনে। কিন্তু এবারে আর আমি একা নই। সঙ্গে আছেন—দেবকীদা, অসিত ও প্রাণেশ।

পরদিন প্রত্যুষে পৌঁছলাম রাঁচি—বিহারের সব চেয়ে সুন্দর শহর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী। একটা হোটেলে স্নান খাওয়া সেরে, ট্যাক্সিতে সওয়ার হওয়া গেল। রাঁচি থেকে বাসে করেও নেতারহাট যাওয়া যায়। দুপুরের বাস সন্ধ্যায় নেতারহাট পৌঁছয়। ভাড়া জনপ্রতি পাঁচ টাকা। কিন্তু বাসে গেলে সূর্যাস্ত দেখা যায় না। আর সূর্যাস্ত না দেখতে পারলে নেতারহাটের অর্ধেক অদেখা থেকে যায়। বাস গিয়ে থামে ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে। সেখান থেকে সূর্যাস্ত দর্শনের স্থান ম্যাগ্‌নোলিয়া পয়েন্ট ছ'মাইল। সূর্যাস্তের আগে সেখানে পায়ে হেঁটে পৌঁছন সম্ভব হলেও, সূর্যাস্তের পরেও সেই ছ'মাইল নির্জন জংলা পথ পেরিয়ে লোকালয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পরে এ সব অঞ্চলে এখনও ভালুকের পদধূলি পড়ে।

বেলা একটায় ট্যাক্সি ছাড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামে প্রবেশ করলাম। পথের দুধারে সবুজ ক্ষেত। বর্ষা বিগতপ্রায়। মাটি বেশ নরম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলাশয় আর খুদে খুদে পাহাড়। বিভিন্ন ধরনের পাহাড়। কোনটি মাটির

কোনটি পাথরের, কোনটি সবুজ কোনটি ধূসর। কঠিন পাথরের পাহাড় হলেও, চারিপাশের মাটি কিন্তু কোমল। এইটেই বিহারের বৈশিষ্ট্য। বিহারের পাহাড় সমতলের অংশবিশেষ, সমতলের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়।

পথের দু'ধারে বট অশ্বত্থ আম আর মহুয়া গাছের সারি। তবে খুব ঘন নয় বলে এ পথটি জামশেদপুর—রাঁচি রোডের মতো ছায়াশীতল নয়। মাঝে মাঝে করবীর সারি। এত বেশি করবী গাছ একসঙ্গে আমি আর কোথাও দেখি নি।

দূরে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা দেখা যাচ্ছে। হয়তো বা নিকটতর হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। আমরা কেবল অপলক নয়নে চেয়ে রয়েছি সেদিকে।

আটচল্লিশ মাইল এসে লোহারডাঙ্গা—একটি সমৃদ্ধ জনপদ। ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোম্পানীর কারখানা এখানে। রোপওয়ের সাহায্যে নিকটবর্তী বাগ্‌রু পাহাড় থেকে বক্‌সাইট বা খনিজ এলুমিনিয়াম নিয়ে আসা হয়। বাগ্‌রুর বক্‌সাইট ভারতের শ্রেষ্ঠ। ভারতে ২৫৮ লক্ষ টন বক্‌সাইট সঞ্চিত রয়েছে, এর মধ্যে কেবল রাঁচি ও পালামৌ জেলাতেই আছে ৯০ লক্ষ টন।

লোহারডাঙ্গায় কয়েক মিনিট থেমে আবার চললাম এগিয়ে। তেমনি সমতল পথ। পথের দুধারে গাছ, তারপরে পাহাড় আর ক্ষেত। সাঁওতাল মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করছে, চলেছে হাটে। যৌবনের গান গেয়ে হেলে দুলে পথ চলেছে।

বেশ কিছুদূর এসে খাগরা। ডাকঘর, পুলিশ ফাঁড়ি ও গুটি তিনেক চায়ের দোকান।

খাগড়া ছাড়িয়ে চলেছি এগিয়ে। চলেছি ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে। হঠাৎ ড্রাইভার গাড়ির গতি দিল কমিয়ে, রাস্তা ছেড়ে গাড়ি নামিয়ে আনল পথের পাশে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডান দিক দিয়ে ঝড়ের বেগে বড় একখানি গাড়ি গেল

বেরিয়ে। বিস্মিত হয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি, "কে গেলেন ও গাড়িতে ?"

গাড়িকে আবার বাঁধানো রাস্তায় তুলে এনে ড্রাইভার জবাব দেয়, "বলতে পারি না।"

"তা হলে এমন করে ওকে রাস্তা ছেড়ে দিলে কেন ?"

"দেব না ? গাড়ির সামনে ফ্লাগ রয়েছে দেখলেন না ?"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করি, "গাড়ির সামনে পতাকা থাকলে কি হয় ?"

ড্রাইভার বোধকরি বিস্মিত হয় আমার অজ্ঞতায়। মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপরে বলে, "নিশ্চয়ই কোন নেতা নেতারহাট যাচ্ছেন।"

বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকি। বৃটিশ আমলে নেতারহাট বৃটিশ শাসকদের স্বাস্থ্যাবাস ছিল। সে আমলেও নিশ্চয়ই নেতারহাটের শ্বেতাঙ্গ দর্শনার্থীদের গাড়িতে পতাকা লাগানো থাকত আর এমনি করেই নেটিভরা তাঁদের পথ ছেড়ে দিতেন। স্বাধীন ভারতে পতাকার রং পালটেছে, কিন্তু পথ-চলার ঢঙ পালটায় নি।

রাঁচি থেকে ৮৩ মাইল এসে বানারী—তিনটি পথের সঙ্গম। ডানদিকের পথটি গেছে লাতেহার (৩১ মাইল) হয়ে ডাল্টনগঞ্জ (৪৮ মাইল) আর বাঁ দিকেরটি নেতারহাট। এখান থেকে ১৩ মাইল।

বানারীর পরেই পথের প্রকৃতি পালটে গেল। জঙ্গল শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। এবারে আরম্ভ হল চড়াই-উৎরাই। তবে মসৃণ পিচঢালা পথ। পথের দু-পাশে গভীর বন। বনের বুকে কেউ যেন সবুজ একখানি কার্পেট দিয়েছে বিছিয়ে।

এতক্ষণ যেমন ওপরে উঠেছি, তেমনি নিচেও নেমেছি। এবার শুরু হল কেবল ওপরে ওঠা। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। পাহাড়ে পাথরের চেয়ে মাটির অংশ বেশি। ফলে ঘন জঙ্গল সবুজ গাছ আর রঙীন ফুল। মাঝে মাঝে বাঁশবন। বেশ প্রশস্ত পথ—দুখানি

গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় সবুজ সমতল। চারদিকেই সবুজের সমারোহ। পাহাড়ী পথ মাত্রই সুন্দর। কিন্তু সে সৌন্দর্যেরও তারতম্য আছে। এমন সুন্দর পথ বড় বেশি দেখা যায় না।

এক সময় সহসা চড়াই শেষ হয়ে গেল। শুরু হল সমতল। পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছি—শিখরারোহণ করেছি। কিন্তু এ পাহাড় সে পাহাড় নয়। পর্বত হয় ত্রিভুজাকৃতি, তার শিখর হয় সঙ্কীর্ণ। এ পর্যন্ত ভারতীয় অভিযাত্রীরা যে সব পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন, তার মধ্যে সঙ্কীর্ণতম হল নীলগিরি (২১,২৬৪´) কোন রকমে একজন লোক দাঁড়াতে পারে। আর প্রশস্ততম হল নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫´) প্রায় দুশ' ফুট লম্বা ও একশ ফুট চওড়া। হিমালয়ে দেখি নি, আজ দেখলাম, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এক পর্বত শিখর—সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা।

নেতারহাটকে পর্বতশিখর না বলে মালভূমি বললেই বোধকরি ঠিক বলা হবে। তবে সে যাই হয়ে থাক, তাতে কিছুই যায় আসে না। নেতারহাট সুন্দর, নেতারহাট রমনীয়, নেতারহাট অবশ্য দর্শনীয়।

সবুজ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর পেরিয়ে আমরা লোকালয়ে এলাম। পথের দু-ধারে বাগানবাড়ি ও বাংলো। তিনটি ডাকবাংলো রয়েছে এখানে—রাঁচি পালামৌ ও ফরেস্ট। আর আছে একটি ইয়ুথ হস্টেল। অনেক বাড়িতে ভাড়া দিলে আশ্রয় পাওয়া যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়।

দুটি স্কুল আছে নেতারহাটে—সিনিয়ার বেসিক স্কুল ও নেতারহাট পাবলিক স্কুল। পাবলিক স্কুলটি দেখার মতো। এটি নেতারহাটের বৃহত্তম অট্টালিকা। স্কুলের সামনে সুবিশাল ময়দান—নিয়মিত খেলাধূলা হয়। ১৯৫৪ সালে বিহার সরকার এই স্কুল খুলেছেন। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় পাঁচশ'। এখানে শতকরা পঁচাত্তর জন ছাত্র নেওয়া হয় অনুন্নত সম্প্রদায়ের (Scheduled castes and

Tribes) মধ্য থেকে। অভিভাবকদের মাসিক আয়ের ওপর ছাত্রদের খরচ ধার্য হয়। একশ টাকা পর্যন্ত আয়ের অভিভাবকদের কাছ থেকে কিছুই নেওয়া হয় না। একশ ছেষট্টি জন ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ানো হয়। পনেরটি ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বাস করে। এইসব ছাত্রাবাসকে বলা হয় আশ্রম। ন'টি ছাত্রের জন্য একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। এখানে ছাত্রদের সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং হিন্দী ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিহার সরকার এই বিদ্যালয়ের জন্য বছরে বারো লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

নেতারহাটের অপর দর্শনীয় স্থান এগ্রিকাল্‌চারাল ফার্ম। এটি এখানকার দুধ ঘি ও মাখন সরবরাহের উৎস। আরও দুটি অবশ্য দর্শনীয় বস্তু আছে নেতারহাটে -আপার ঘাগরি ও লোয়ার ঘাগরি জলপ্রপাত। প্রথমটিতে বেদিং পুল ও দ্বিতীয়টিতে সুইমিং পুল আছে।

নেতারহাট সমুদ্র সমতা থেকে ৩৬৯৬ ফুট উঁচু। এর আয়তন ১৬ বর্গমাইল। ভারতের বহু প্রথম শ্রেণীর শৈলাবাস থেকেই নেতারহাট বৃহত্তর। সমতল বলে এখানে বাড়ি তৈরিও সহজ। আদর্শ এখানকার আবহাওয়া, মনোরম এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। দূরত্ব রাঁচি থেকে মাত্র ৯৬ মাইল। প্রায় ষাট বছর পূর্বে সংকলিত এক বিবরণীতে লেখা হয়েছে—

'The breezy downs and the song of the lark by day and by night, the stillness of the jungle and the great constellations swinging slowly overhead, bring refreshment after the dust and heat of the plains.'

কিন্তু আজও এই অঞ্চলের মোট স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র চার হাজার। এখানে জনবসতি গড়ে না ওঠার প্রধান কারণ জলাভাব ও ম্যালেরিয়া। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটি সেনানিবাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জলাভাবের জন্য তাঁদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এই একই কারণে এক ইয়োরোপীয় কোম্পানীর চা-বাগান তৈরির পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে অবশ্য একটি জলাশয় খনন করে স্থানীয় অধিবাসীদের পানীয় জলের অভাব দূর করা হয়েছে। এখন এখানে কয়েকটি সরকারী অফিস হয়েছে। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া এখনও বিশেষ কমে নি। অথচ জল-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান ও ম্যালেরিয়া নির্মূল করা আধুনিক যুগে মোটেই অসম্ভব নয়। নেতাদের উদাসীনতার জন্যেই নেতারহাট আজও প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হতে পারেনি।

ইদানীং অবশ্য বিহার সরকার নেতারহাট উন্নয়নের একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। রাঁচি এখন বৃহৎ শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে তার নাম প্রায় গিয়েছে হারিয়ে। অথচ এ অঞ্চলে একটি স্বাস্থ্যকর স্থানের প্রয়োজন অপরিহার্য। নেতারহাট ভাবীকালের সেই স্বাস্থ্যাবাস।

ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। এখনও বেশ রোদ রয়েছে—সূর্যাস্তের দেরি আছে। এই অবসরে আশ্রয়ের বন্দোবস্তটা সেরে ফেলা যাক। আমরা গাড়ি থেকে নেমে অফিসে প্রবেশ করি। কিন্তু হায়! অফিস অফিসার-শূন্য। টেবিল-চেয়ার কাগজপত্র সবই রয়েছে, শুধু মানুষ নেই। অতএব পাশের কো-অপারেটিভ স্টোরস্-কাম্-ক্যান্টিনে অনুসন্ধান করি। জানতে পারি —তিনি নাকি রাঁচি থেকে বাস এলে অর্থাৎ সন্ধ্যাসমাগমে সমাসীন হবেন অফিসে। ক্যান্টিনের কর্মচারীরা আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারলেন না কিন্তু সিঙ্গারা পরিবেশন করলেন। সিঙ্গাড়া এখানকার নিয়মিত সামগ্রী নয়। জনৈক মন্ত্রীমহোদয়ের শুভাগমনে বিশেষ সামগ্রীরূপে প্রস্তুত হয়েছে। তা থেকেই আমরা দুটি করে প্রসাদ পেলাম।

প্রসাদ খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়া গেল পথে- আশ্রয়ের অন্বেষণে। এলাম রাঁচি ডাকবাংলোয়। এটি রাঁচির নির্মাণ বিভাগের এস. ডি. ও-র অধীনে। ডাকবংলোর সামনে এসে গাড়ি

থেকে নামতে গিয়ে চমকে উঠি। এ কোথায় এলাম। একি নেতারহাট না নৈনিতাল? ডাকবাংলোর বাসিন্দাদের ভাষা-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তো বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আমরা নিতান্তই নির্লজ্জ। নিজেদের পোষাকের কথা বিবেচনা না করেই নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। চৌকিদারের শরণাগত হলাম। সে আমাদের দেখে নিয়ে একটু মুচকি হেসে জানাল—আমাদের জন্য কোন ঘর খালি নেই এখানে।

তারপরে এলাম পালামৌ ডাকবাংলোতে। এটি পালামৌ জিলা পরিষদের সম্পত্তি ও নেতারহাটের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ডাল্টনগঞ্জের ডেপুটি কলেক্টরের কাছ থেকে বাস করার অনুমতি নিতে হয়। আমরা তাঁর অনুমতি নিই নি, তাই চৌকিদারের উমেদার হয়েছি।

ডাকবাংলোটি বড়ই সুন্দর। সামনে কাঁকর বিছানো অর্ধ-বৃত্তাকার আঙ্গিনা—ইটের রেলিং দিয়ে ঘেরা। কাল সকালে এখানে দাঁড়িয়েই আমাদের সূর্যোদয় দেখতে হবে। আঙ্গিনার শেষে বাগান। তারপরে প্রশস্ত বারান্দা। বেশ বড় বড় ঘর—লাগোয়া বাথরুম। কোন-কোন ঘরে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। ডাকবাংলোর পেছনে রান্নাঘর, বেয়ারা-বাবুর্চির ঘর ও গাড়ি রাখার ঘর। এক কথায় চমৎকার বন্দোবস্ত। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? উমেদারী বিফল হল। চৌকিদার জানালে--আমাদের ঠাঁই হবে না এই রমণীয় আবাসে। কারণ মন্ত্রীমহোদয় এসে গেছেন—ভি. আই. পি-দের ভিড়ে ভরে গিয়েছে ডাকবাংলো।

ফরেস্ট ডাকবাংলো ও ইয়ুথ হস্টেলের চৌকিদারযুগলও একই সন্দেশ পরিবেশন করল। বেশ বুঝতে পারছি আগের থেকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে নেতারহাটে আসা ঠিক নয়। সেই কোন আমলে এখানে চারটি ডাকবাংলো নির্মিত হয়েছিল। তারপরে স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। কিন্তু নেতারহাটের

কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। তৈরি হয় নি কোন ট্যুরিস্ট লজ্ কিংবা ভাল ক্যান্টিন। রাস্তায় আলো দেওয়া হয় নি। উন্নতি হয় নি পরিবহন ব্যবস্থার।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের উপেক্ষার কথা ভেবে কি হবে? এ দিকে বেলা পড়ে আসছে, দিবাকর এগিয়ে যাচ্ছে অস্তাচলের কাছে। আশ্রয় অন্বেষণে আর সময় নষ্ট করলে সূর্যাস্ত দর্শন হবে না। কাজেই আশ্রয়ের প্রশ্ন আপাতত মুলতবী রেখে আমরা রওনা হলাম ম্যাগ্‌নোলিয়া পয়েন্টের দিকে।

তৃণাচ্ছাদিত মাঠ আর সবুজ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কাঁচা পথ। পথের পাশে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়। বড় গাছ এদিকটায় কম, তবে একেবারে যে নেই তা নয়। মাঝে মাঝে পাইন আর দেবদারুর সমষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় ওরা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের স্নেহে ও যত্নে রোপিত ও বর্ধিত!

এই রমণীয় স্থানে প্রথম বিদেশী পদক্ষেপ পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁর নাম স্যার এডওয়ার্ড গেইট। তিনি ছিলেন বিহারের তৎকালীন লেঃ গভর্নর। শিকার করতে করতে তিনি এখানে এসে উপস্থিত হন। চারিপাশের পর্বতমালা ও কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকা আর এই শ্যামল ও সমতল শিখরের সৌন্দর্যে মোহিত হলেন তিনি। ফিরে গিয়ে এই সৌন্দর্যের কথা প্রচার করলেন সবার কাছে। তারপরে এখানে একটি বিশেষ ধরনের কুটির (The Chalet) নির্মাণ করালেন। এটি পরবর্তীকালে বিহারের কয়েকজন লেঃ গভর্নরের স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হয়েছিল। কুটিরটি এখনও অক্ষত আছে। বর্তমানে পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল এর দোতলায় বাস করেন, নিচের তলায় হাসপাতাল।

অবশেষে ছ-মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা নেতারহাটের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছলাম। এখানে শিখরটি সহসা শেষ হয়ে গিয়েছে। খুব উঁচু বাড়ির ছাদে দাঁড়ালে যেমন মনে হয়, আমাদেরও ঠিক তেমনি

মনে হচ্ছে। বহুদূর পর্যন্ত পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কয়েকটি শৈলশিরা আর তাদের পেছনে আকাশ মিশেছে মাটিতে।

এতক্ষণ আমরা প্রায়-বৃক্ষহীন প্রান্তর পেরিয়েছি। কিন্তু এখানে বেশ বড় বড় গাছপালা—অবিকল একটি বাগানের মতো। এতক্ষণ আমরা যে প্রান্তরটি পেরিয়ে এসেছি, সেখানে পাথর চোখে পড়ে নি, কিন্তু এখানে বহু বড় বড় পাথর রয়েছে দেখছি। এক কথায় এটি নেতারহাটের অংশ হয়েও যেন আলাদা। এর একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই বোধকরি গভর্নর দুহিতা ম্যাগ্‌নোলিয়া ছুটে আসতেন এখানে। অশ্রুপাত করতেন তাঁর প্রিয়তমের জন্যে। সেই ইংরেজ বিরহিণীর নাম থেকেই এই শান্ত-সুন্দর কাননের নাম হয়েছে ম্যাগ্‌নোলিয়া পয়েণ্ট।

আমাদের আগেই বহু দর্শনার্থী এসে গেছেন। প্রত্যেকেই গাড়িতে এসেছেন। গাড়িগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। দর্শনার্থীরা সুবিধা মতো স্থানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছেন। প্রায় সর্বভারতীয় সমাবেশ। এসেছেন অসমীয়া বাঙালী বিহারী, গাড়োয়ালী কুমায়ুনী পাঞ্জাবী গুজরাটী মারাঠী মাদ্রাজী। শিশু থেকে বৃদ্ধ, শাড়ী থেকে স্ল্যাক্‌স, ধুতি থেকে প্যারালাল— সবই শোভা পাচ্ছে এই সমাবেশে। ক্যামেরা বাইনোকুলার ট্রান্‌জিস্টার কোন কিছুরই অভাব নেই। কেউ গান শুনছেন, কেউ গান গাইছেন আর কেউবা শিষ দিচ্ছেন। বক্তারা কেউ হোমের, কেউ 'রাশ্যার' কেউবা 'ম্যারিকার' কথা বলছেন। তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক এবং অভিন্ন। তাই তাঁরা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন পশ্চিমাকাশের দিকে। পৃথিবীর কাছ থেকে অস্তাচলগামী দিবাকরের দৈনন্দিন বিদায় দৃশ্যটি দর্শন করার প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

অবশেষে সেই মনোরম মুহূর্তটি মূর্ত হল। নীলাকাশ লাল হল, সাদা মেঘ সোনালী হল, কালো পাহাড় ধূসর হল।

একখানি সুবিরাট সুবর্ণ গোলক দেখা দিল আকাশের বুকে।

সে ক্রমে নেমে আসছে নিচে। দিগন্তের কাছে একেবারে ঐ পাহাড়ের শিরে। তারপরে, আরও...আরও কাছে...।

একখানি গোলক আধখানি হল। অবশেষে ধীরে ধীরে সে অপসৃত হল আমাদের দৃষ্টির বাইরে।

আকাশের রং পালটাচ্ছে, মেঘের রং পরিবর্তিত হচ্ছে, পাহাড়ের রং বদলে যাচ্ছে। শব্দমুখর জগৎ এবারে নীরব হবে, কর্মময় মানুষ এখন বিশ্রাম নেবে, দিনের শেষে পৃথিবী পরিণত হবে ঘুমের দেশে।

'গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লিনগর 'পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে ॥'

মনে পড়ে কবিগুরুর এই অমর কবিতার সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়ের কথা। কবি তখনও আছেন আমাদের মাঝে। মফস্বল শহরের নামকরা স্কুল বড় হলঘর ছাত্রে বোঝাই হয়ে গেছে। রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করা হচ্ছে। বাংলার মাষ্টারমশাই সভাপতিত্ব করছেন। ছেলেরা বক্তৃতা দিচ্ছে, গান গাইছে, আবৃত্তি করছে। ওপরের শ্রেণীর একটি ছাত্র উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করল এই অমর কবিতা—'বন্দীবীর'। আবৃত্তি শেষে 'দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ ॥'

বাদশাজাদা ও কাজীর প্রতি আমার শিশুমন উঠল বিষিয়ে। বন্দা ও তাঁর পুত্রের জন্য অন্তর উদ্বেলিত হল আমার দু'চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু পড়ল গড়িয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্ন শিশুমনে সাড়া জাগিয়ে ছিল—কোথায় সেই পঞ্চনদীর তীর, কারা সেই বীর শিখ আর কতদূরে সেই গুরুদাসপুর ?

এইমাত্র আমাদের বাস এসে থামল গুরুদাসপুরে—আমার শৈশবের সেই স্বপ্নভূমিতে। গুরুদাসপুর জেলা সদর। বেশ বড় শহর। বাস কয়েক মিনিট দাঁড়াবে এখানে। আজ সকালে আমরা এসেছি পাঠানকোট। এখন পাঠানকোট থেকে চলেছি

অমৃতসর। ৬৭ মাইল দীর্ঘ এই পথে সারা দিন বাস চলে। ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে।

আজ কেবলই মনে পড়ছে সেই শৈশবের কথা। মনে পড়ছে আমার সেই জন্মভূমির কথা, যেখানে বসে প্রথম আমি গুরুদাস-পুরের রূপ কল্পনা করেছিলাম। সেদিনকার সেই কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত—আমি গুরুদাসপুরে এসেছি। কিন্তু আজ কোথায় আমার সেই জন্মভূমি?

আমার সেই স্বদেশে, আমি আজ বিদেশী। বিদেশী বললে কম বলা হয়। বিদেশে আমি যেতে পারি, কিন্তু যেতে পারি না আপন দেশে। কলকাতা থেকে বারো শ' বারো মাইল রেলে চেপে পাঠান-কোট এসে, সেখান থেকে বাসে করে আসতে পারি গুরুদাসপুরে। কিন্তু মাত্র দুশ' বার মাইল দূরবর্তী পূর্ববঙ্গের সেই শ্যামল স্নিগ্ধ সুন্দর শহরটি আজ আমার পার্থিব-পদক্ষেপের বাইরে।

গুরুদাসপুর বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ বড়। পাঠানকোট-অমৃতসর ও পাঠানকোট-জলন্ধর রুটের সব বাসই কয়েক মিনিট দাঁড়ায়। এখান থেকে একটি মোটরপথ গেছে অমৃতসর আর একটি মুকেরিয়ান হয়ে জলন্ধর।

মসৃণ সোজা সমতল পথ দিয়ে বাস চলেছে ছুটে। গুরুদাসপুর শহর ছাড়িয়েই আবার পথের দু'ধারে সবুজ ক্ষেত—ধান গম ভুট্টা ও সবজি। মাঝে মাঝে খাল—তীব্র বেগে জল যাচ্ছে বয়ে, যাচ্ছে পাকিস্তানে। যাচ্ছে সে দেশের মাটিকে সুজলা করতে। ওরা আমাদের সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, আমরা ওদের জল দিয়ে যাব। আমরা যে শান্তিকামী।

কিছুক্ষণ পরে বাস এসে থামল ধারিওয়াল—পশম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। বাস থেকেই কারখানা দেখা যায়।

আরও কিছুদূর এসে বাটালা—পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত শিল্প-নগরী। পথের দু'ধারেই কারখানা। গত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা

বেশ কিছু বোমা ফেলেছে এখানে। এখান থেকে অমৃতসর খুবই কাছে। ওরা অমৃতসরে বোমা ফেলতে এসে হাবিলদার রাজু ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সুবিধা করে উঠতে পারে নি। রাজু একাই তেরখানি পাকিস্তানী বিমান ভূপাতিত করে অমৃতসরের জনজীবনকে রক্ষা করেছিলেন। অমৃতসরের কৃতজ্ঞ মানুষরা যুদ্ধের শেষে তাই রাজপথে রাজুকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। তাঁরা চাঁদা তুলে তাঁকে এক লক্ষ টাকার তোড়া উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক রাজু তাঁর বীরত্বের সেই পুরস্কার প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করে দিয়েছেন।

অমৃতসর থেকে তাড়া খেয়ে পালাবার পথে পাকিস্তানী বিমান হালকা হবার জন্য বোমাগুলি যত্রতত্র বর্ষণ করে যেত। তারই কিছু বোমা বাটালায় পড়েছে। যা পড়েছে, তার অবশ্য সবগুলি ফাটে নি। আর যা ফেটেছে, তারও আজ কোন চিহ্ন নেই। বাটালার বীর মানুষরা বিস্মৃত হয়েছেন, সেই দুঃখ-দিনের স্মৃতি। তাঁরা নতুন উদ্যমে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

বাস রাস্তার ডানদিকে মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছে রেল লাইন। কাদিয়া থেকে বাটালা হয়ে অমৃতসর গেছে ঐ রেলপথ। রেল-পথের পাশে পাশে ইলেকট্রিক লাইন।

আমাদের পথের দু'ধারে আম জমি আর অশ্বত্থ গাছ। কয়েকদিন আগে এদিকে খুব ঝড় হয়ে গেছে। বহু গাছ হেলে পড়েছে পথে ও পথের পাশে। তাদের পাশ কাটিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে।

অমৃতসর শহরের সীমায় এসে গেছি আমরা। দু'দিকে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট। জনবহুল পথ। অমৃতসর ভারতের অন্যতম জনবহুল শহর। পনেরো বর্গমাইলে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস।

আমাদের বাস বাসস্ট্যাণ্ডে এসে নিশ্চল হল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে বিশাল বাসস্ট্যাণ্ড। অফিস স্টল ওয়েটিং হল, বুকিং কাউণ্টার —বাসের শব্দ, যাত্রীদের হট্টগোলে সর্বদা মুখরিত। লম্বা বারান্দার

ধারে নম্বরওয়ালা ছোট ছোট প্লাটফর্ম। একটির পর একটি বাস এসে থামছে, যাত্রীরা নামছে—উঠছে, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। বাসস্ট্যাণ্ডটি সরকারী কিন্তু সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে বেসরকারী বাসও ব্যবহার করে এই বাসস্ট্যাণ্ড।

বাসস্ট্যাণ্ডের বাইরে এসে আমরা একটি টাঙ্গার সওয়ার হলাম। অবশ্য নীরবে নয়। আরোহণের পূর্বে অসিত বহুক্ষণ ধরে দরাদরি চালালে। ফলে দশ টাকার জায়গায় ছ' টাকায় রফা হল। জনাকীর্ণ শহরের সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন পথ দিয়ে টাঙ্গা চলল।

কিছুক্ষণ পরেই পৌছলাম স্বর্ণমন্দিরের সামনে। অমৃতসর দর্শনার্থীরা এখান থেকেই দর্শন শুরু করেন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল এই শহর।

ছিল একটি গণ্ডগ্রাম। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ শিখগুরু রামদাস এলেন সেই অখ্যাত গ্রামে। কিছু জমি যোগাড় করে খনন করালেন এক সুবিশাল সরোবর। স্থানটির নাম হল চক্-রামদাস বা রামদাসপুর। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন সেই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করান। সরোবরের বারিরাশিকে পবিত্র করে সরোবরের নামকরণ করেন অমৃত-সরোবর। সেই থেকেই শহরের নাম—অমৃতসর।

গুরু অর্জুন কিন্তু কেবল মন্দির নির্মাণ করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন না। তিনি পূর্ববর্তী শিখগুরুগণের রচনা এবং হিন্দুভক্ত ও মুসলমান সুফীদের উপদেশ সংগ্রহ করে গ্রন্থসাহেব রচনা করে এই মন্দিরে স্থাপন করলেন। এ মন্দির পরিণত হল শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থে। অমৃতসর পরিণত হল জনপ্রিয় শহরে। সেই থেকে প্রতিবছর নববর্ষ (১লা বৈশাখ) ও দেওয়ালীর দিনে হাজার হাজার পুণ্যার্থী শিখ এই মন্দির তলে সমবেত হয়ে সরোবরে পুণ্যস্নান করে থাকেন।

গুরু অর্জুন নির্মিত সেই মন্দির কিন্তু আজ আর এখানে নেই। ভারতের অন্যান্য অগণিত মন্দিরের মতো বিধর্মীর রোষানলে ভস্মীভূত

হয়ে গেছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী সেই মন্দির ধ্বংস করে ফেলে।

কিন্তু যা অবিনশ্বর তা কি কখনও চিরতরে ধ্বংস করা যায়? আবদালীর সাধ্য কি এই পবিত্র তীর্থ বিনষ্ট করে? পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ (১৭৮০—১৮৩৯ খৃঃ) শ্বেতপাথর দিয়ে পুনরায় এই মন্দির নির্মাণ করান। নবনির্মিত মন্দিরের চূড়াটি তিনি সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন। সেই থেকে স্বর্ণমন্দির কেবল শ্রেষ্ঠ শিখতীর্থ নয়, ভারতের অবশ্য দর্শনীয় বস্তুসমূহের অন্যতম।

পাঞ্জাব-কেশরী প্রধান মন্দিরের প্রবেশ পথে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করে এই মন্দির নির্মাণের সৌভাগ্য দানের জন্য গুরুগণকে বিনীত ধন্যবাদ জানিয়ে গেছেন।

সৌভাগ্য শুধু পাঞ্জাব-কেশরীর নয়, সৌভাগ্য সংখ্যাতীত দর্শনার্থীর, সৌভাগ্য আমাদের। তাঁর কৃপাতেই আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি এই পবিত্র তীর্থে। এসো, আমরাও ধর্মপ্রাণ পাঞ্জাব-কেশরীকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

টাঙ্গা থেকে নেমে মন্দিরের বহিরাঙ্গনে আসি। বাঁধানো আঙিনা —বাঁ দিকে সারি-সারি দোকান, কালীঘাট কিংবা কাশীতে মন্দিরের সামনে যেমন দোকান আছে। দোকানের সামনে প্রধান তোরণ। অমৃত সরোবরের চারদিকে চারটি তোরণ। সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে শিখধর্ম। শিখতীর্থে তাই সকলের অবাধ প্রবেশ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নামে উৎসর্গীকৃত এ চারটি তোরণ।

তোরণের ডানদিকে যাতুঘর। সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় একখানি বড় হলঘর। সাধারণতঃ যাতুঘর বলতে আমরা যেমন বুঝে থাকি, এটি তেমন নয়। এখানে কোন প্রাচীন মূর্তি বা শিলালিপি নেই। আছে সেকালের শিখদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও শিখ ইতিহাসের কিছু বাস্তব চিত্র—যুবক শিল্পী কৃপাল সিং অঙ্কিত।

কিন্তু যাদুঘর এখন বন্ধ। বিকেল চারটেয় খুলবে। চারটের অনেক দেরি।

যাদুঘরের পাশেই হাত-পা ধোবার জলের কল ও চৌবাচ্চা। হাত-পা ধুয়ে তোরণের সামনে আসতেই, একজন বল্লমধারী শিখ আমাদের কাছে এলেন। পকেটের রুমাল বের করে মাথায় বাঁধতে বললেন। নগ্নপদে ও আবৃত মস্তকে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সঙ্গে বিড়ি সিগারেট থাকলে বাইরে রেখে যেতে হয়।

তোরণটি সুবিরাট। বহু পুণ্যার্থী দর্শণ শেষে আশে-পাশে বসে বিশ্রাম করছেন। তোরণ পেরিয়ে এলেই সরোবর। চারিপাশে পাথর বাঁধানো প্রশস্ত পথ। পথের তিন দিকেই সারি সারি ঘর।

মন্দিরটি সরোবরের মধ্যস্থলে। চারিপাশে দিয়ে পাথর বাঁধানো বারান্দা। সেই পথ পেরিয়ে আমরা মন্দিরের সামনে এলাম। অপূর্ব সুন্দর মন্দির—তিন তলা। নিচের তলায় সুদৃশ্য গ্রন্থাধারের ওপরে গ্রন্থসাহেব। দেওয়ালে সোনা ও শ্বেতপাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ফুলের নকশা। চারিদিকে বারান্দা—দু'দিক থেকে দু'সারি সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে।

মন্দিরের মেঝে নরম গালিচায় ঢাকা। ওপরে মখমলের চন্দ্রাতপ। তাতে একটাকা পাঁচটাকা ও দশটাকার নোট ঝুলছে। গ্রন্থসাহেবের সামনেও বহু টাকা পয়সা—ভক্তদের প্রণামী। ভক্তবৃন্দ বসে আছেন গালিচার ওপরে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক হারমনিয়ম সহযোগে ভজন গাইছেন, আর একজন বৃদ্ধ তবলা সঙ্গত করছেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অবনত মস্তকে সেই সুমধুর সংগীত শ্রবণ করছেন। এখানে প্রতিদিন এমনি ভজনের আসর বসে। পরিবেশটি বড়ই ভাল লাগল।

মন্দিরের পেছন দিকে ঘাট। এখানে দাঁড়িয়ে ভক্তরা সরোবরের বারিরাশিকে অমৃত-জ্ঞানে পান করছেন। সরোবরের তীরেও স্নানের ঘাট রয়েছে। বদ্ধ জলাশয় বলে জল তেমন পরিষ্কার নয়।

কিন্তু ভক্তদের তাতে কিছুই যায় আসে না। তাঁরা সরোবরের অমৃতধারা পান করে ধন্য হচ্ছেন। এ পান অমৃতপান, এ স্নান ভক্তিস্নান, এ সুযোগ পরম-সৌভাগ্য।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে দু'তলায় উঠে এলাম। সুসজ্জিত ঘর। একখানি সুবিশাল গ্রন্থাধারের ওপর বিশালতর একখানি গ্রন্থসাহেব। এই অংশটুকু বিশেষভাবে সজ্জিত। এতবড় গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর দেখি নি। ঘরের অপর পাশে দু' জায়গায় আরও দু'খানি গ্রন্থসাহেব। তিনজন লোক মনোযোগ দিয়ে গ্রন্থ তিনখানি পাঠ করছেন। সর্বদা গ্রন্থসাহেব পাঠ ও ভজন গান এ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য।

মূল মন্দিরের উপরকার ঘরখানির মাঝখানটা ফাঁকা। চারিদিকে বারান্দা। বারান্দায় বসে নিচের তলাটা পরিষ্কার দেখা যায়। অনেকেই এখানে বসে গান শুনছেন।

দু'তলার দু'দিক থেকে দু'সারি সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। তিনতলায় একখানি ঘর ও ছাদ। ঘরখানি তেমনি সুসজ্জিত। একজন শিখ মনোযোগ সহকারে গ্রন্থসাহেব পাঠ করছেন। পাঠক পূজারী ও সাহায্যকারীরা সকলেই শিখসংস্থার কর্মচারী।

ছাদ থেকে সরোবরটি চমৎকার দেখা যায়। সুজয়ার তাগিদে আমরা এসে ছাদে দাঁড়ালাম। পরিচয় হল একজন বৃদ্ধ কর্মচারীর সঙ্গে। বহুকাল ধরে তিনি কাজ করছেন এখানে। শিখ দরবারে বহু ইতিহাসের নীরব দর্শক। সুজয়ার প্রশ্নের উত্তরে সর্দারজী জানালেন, 'অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে স্বর্ণমন্দিরে।'

মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে বাবা অটলের স্তম্ভটি দেখিয়ে দিলেন তিনি। নয় তলা উঁচু অষ্টকোণাকৃতি এই স্তম্ভটি ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দের পুত্র অটল রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে।

সর্দারজী আমাদের অনুরোধ করলেন, যাদুঘর ও আকাল তখ্ত দর্শন করতে। বললেন 'চারটের সময় আমি দাঁড়িয়ে থাকব বড় যাদুঘরের সামনে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব সব।'

'বড় যাতুঘর ?' বুঝতে পারি না সর্দারজীর কথা।

'এখানে তুটি যাতুঘর আছে। একটির কথা আগেই বলেছি। আর একটি সরোবরের তীরে। এটি মন্দির সংক্রান্ত যাতুঘর। এখানে গ্রন্থসাহেবের হাতে লেখা নকলের মূল্যবান সংগ্রহ আছে' সর্দারজী বলেন।

আকাল তখ্‌ত শব্দ তুটির অর্থ দেবতার সিংহাসন। গুরু গোবিন্দের ব্যবহৃত বহু অস্ত্র-শস্ত্র সংরক্ষিত আছে এখানে। আকাল তখ্‌ত শিখ সম্প্রদায়ের পার্লামেণ্ট ভবন। তাঁদের দরবার বসে এখানে। সমস্ত প্রধান ঘোষণা এখান থেকেই করা হয়ে থাকে।

মন্দির দর্শন করে আমরা সরোবর পরিক্রমা শুরু করি। শিখ ইতিহাসের প্রধান ঘটনার স্মারকসমূহ ছড়িয়ে আছে সরোবরের তীরে।

একপাশে চৌহদ্দির বাইরে ভোজনালয়। যে কোন দর্শনার্থী ইচ্ছে করলেই এখানে এসে বিনা মূল্যে ভূরিভোজ সারতে পারেন। গুরুগণের জন্মদিন ও অন্যান্য উৎসবের সময় দশ-পনেরো হাজার পুণ্যার্থী এখানে আহার গ্রহণ করেন।

দর্শন শেষে আমরা আসি বাইরে। টাঙ্গায় চড়ে রওনা হই শহীদ উদ্যান জালিয়ানওয়ালা-বাগে—স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই পুণ্যতীর্থে।

স্বর্ণমন্দির থেকে দূরত্ব সামান্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের টাঙ্গা একটি সরু গলির মুখে এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা গলিতে প্রবেশ করি।

এই গলি দিয়ে সেদিন হাজার হাজার দেশপ্রেমিক সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবার তার কিছুক্ষণ বাদে ঘাতক ডায়ার ও তার সঙ্গীরা এই গলিতেই চোরের মতো প্রবেশ করেছিল। এটি শহীদ উদ্যানের একমাত্র পথ। আমরা এগিয়ে চলি। কিছুদূর এসে গলির ডানদিকে লেখা—এখান থেকেই গুলি চালানো হয়েছিল।

গলির শেষে গেট। চারদিক দেওয়ালে ঘেরা, তৃণাচ্ছাদিত একটি প্রায় চতুষ্কোণ উদ্যান। সুজয়া ইতিহাসের ছাত্রী। অসিতের প্রশ্নের

উত্তরে সে বলতে থাকে, 'হ্যাঁ, তখনও এই গলিটি ছিল এখানে যাওয়া-আসার একমাত্র পথ। তারিখটা চিরকাল লেখা থাকবে আমাদের মনের খাতায়, ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা, যে পুণ্যতিথিতে ভগবান বুদ্ধ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং দেহরক্ষা করেছিলেন। কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ অমৃতসরের মুক্তিকামী মানুষের দল সেদিন প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হয়েছিলেন এখানে। ডায়ার তার সৈন্যদের নিয়ে চুপি চুপি এসে গলির মুখে মেশিন গান বসিয়ে বেপরোয়া গোলা বর্ষণ শুরু করেছিল সেই শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র মানুষদের লক্ষ্য করে। শেষ গুলিটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে থামে নি।

স্বাভাবিকভাবেই অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন সভাস্থ সকলে। তাঁরা পালাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। পথ আগলে বসে ছিল বৃটিশ কষাইরা, গুলি আসছিল সেদিক থেকেই। পালাতে গিয়ে বাঁ দিকের কুয়োটার মধ্যে পড়ে সলিল সমাধি লাভ করেছিলেন অনেকে। দেড়হাজার মুক্তিকামী মানুষ সেদিন শহীদ হয়েছিলেন এখানে, পাঁচ শতাধিক হয়েছিলেন আহত। তাঁদের আকুল ক্রন্দনে অমৃতসরের আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। শুধু অমৃতসরই বা বলি কেন, সারা ভারত সেদিন সেই আর্ত চীৎকারে চমকে উঠেছিল। সারা বিশ্ব সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই পৈশাচিক কাহিনী শুনে। আর জালিয়ানওয়ালা-বাগ পরিণত হয়েছে বিশ্বের মুক্তিতীর্থে।'

মুক্তিতীর্থ কিন্তু তেমনি পড়েছিল বহুকাল। কিছুকাল পূর্বে ইউ. এন. মুখার্জি নামক জনৈক বাঙালী স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে প্রান্তরটির প্রভূত সংস্কার সাধন করেছেন। এখন এটি একটি সুন্দর উদ্যান। রক্তবর্ণ বেলে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অপরূপ একটি শহীদ বেদী।

গ্রীষ্মকালে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা ও শীতকালে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে এই উদ্যান।

গেটের বাঁ দিকে একখানি ঘর—অফিস ঘর। বারান্দায় গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র, নেহরু ও রাষ্ট্রপতির ছবি। দেওয়ালের একপাশে সাইনবোর্ড—

'This ground was hallowed by the mingled blood of two thousand innocent Hindus, Sikhs and Musulmans who were Shot by British on 13th April, 1919.

The ground was acquired from the owners by Public Subscriptions.

Sd/ U. N. Mukherjee

Sccretary,

Jallianwala Bagh National Trust.'

উদ্যানের বাঁ দিকে সেই কুয়ো—লোহার তার দিয়ে ঘেরা। পাশে একখানি ফলকে লেখা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

আরও কয়েক পা এগিয়ে আমরা পৌঁছলাম দেওয়ালের ধারে—বেশ কয়েকটি গুলির চিহ্ন রয়েছে এখানে। উদ্যানের আরও কয়েক জায়গায় দেওয়ালের গায়ে এখনও গুলির চিহ্ন রয়েছে। বৃটিশ শাসনের অবসান হয়েছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কুশাসনের কলঙ্কচিহ্ন আজও যায় নি মুছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি কোনদিন মুছে যাবে না আমাদের মন থেকে।

উদ্যানের মধ্যস্থলে অনিন্দ্য সুন্দর শহীদ-বেদী। আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে প্রণাম করি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের, যাঁরা নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে সেদিন পরাধীন ভারতের মুক্তিযজ্ঞ করে গেছেন।

বাইরে এসে আবার টাঙ্গায় ওঠা গেল। টাঙ্গা চলল রণজিৎ সিংহ নির্মিত রামবাগ উদ্যানের দিকে। উদ্যানটি প্রাচীন নগর-

প্রাচীরের বাইরে। বেশ শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ। খুব ভাল লাগল। অসিত তো বলেই ফেলল - শহরের কোলাহলে শরীর ও মনে একটা অবসাদ এসেছিল, এখানে এসে তা দূর হয়ে গেল।

রণজিৎ সিংহ তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি জমাদার খুশহাল সিংহ ও অন্যান্য সর্দারদের বিশ্রামের জন্য নির্মাণ করিয়েছিলেন এই উদ্যান। বিশ্রামশালাটি এখনও রয়েছে। বর্তমানে অমৃতসরের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর এখানে।

ফুলবাগানটি দেখে লোভ সামলাতে পারল না সুজয়া। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, আমরা কিছু বোঝার আগেই একটি ফুল ছিঁড়ে খোপায় গুঁজে নিল।

আরও একটি উদ্যান আছে অমৃতসরে - সুভাষবাগ। নবনির্মিত। পাঠানকোট ফেরার পথে পড়বে এটি। তখন দেখব বলে, এখন এগিয়ে চলি গোবিন্দগড় দুর্গের দিকে।

গোবিন্দগড় দুর্গ দেখে দুর্গিয়ানায় আসা গেল। মন্দিরের নির্মাণ কৌশলটি একেবারে স্বর্ণ-মন্দিরের মতো। তেমনি সরোবরের মধ্যে শ্বেত-পাথরের মন্দির। তবে আকারে ছোট এবং গঠন নৈপুণ্যেও খাটো। তোরণ পেরিয়ে সরোবরের ওপর দিয়ে পাথর বাঁধানো পথ গিয়েছে মন্দিরে। পথের ওপরে একখানি শ্বেতপাথরের ফলক—

'This has been erected in memory of Lala Dabi Shai Gangaram Bharany by Lachman Das Bharany. A. D. 1928.'

লছমানদাস মহান সন্দেহ নেই, কিন্তু মন্দিরটির গড়ন দেখে মনে হয় শিখদের স্বর্ণমন্দিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই নির্মিত হয়েছে এই হিন্দু মন্দিরটি। সে প্রতিযোগিতা আজও আছে। আর তার প্রকাশ হয় দেওয়ালীর সময়। স্বর্ণমন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোক-সজ্জা করা হয় ও আতসবাজী পোড়ানো হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই নাট-মন্দির। মেঝেতে ফরাস পাতা, ওপরে

বৈদ্যুতিক পাখা। দর্শনার্থীরা বসে আছেন। আমরাও বসে পড়ি তাঁদের মাঝে।

বিকেল চারটায় মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হল। মূল-মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত। বাঁ দিকে রাধাকৃষ্ণ, মাঝখানে লক্ষ্মীনারায়ণ আর ডান দিকে রাম লক্ষ্মণ সীতা, ভরত শত্রুঘ্ন ও হনুমান। মূর্তি ক'টি খুবই সুন্দর। বেশ শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ। বড়ই ভাল লাগল আমাদের।

দর্শন শেষে বেরিয়ে আসি পথে। তোরণের বাঁদিকে পথের অপর পারে দুর্গিয়ানার প্রাচীন মন্দির। শ্বেতপাথরের মন্দির। সামনে একটি পেতলের ব্যাঘ্র মূর্তি ও শিবমন্দির। মূল-মন্দিরে কোন পূর্ণমূর্তি নেই, কেবল মায়ের মুখ। মন্দিরের পাশে একটি বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ। অসিতের প্রশ্নের উত্তরে পূজারী বলেন—চার হাজার বছরের পুরনো এই মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল একটি গ্রাম। সেই গ্রামে এলেন গুরু রামদাস। গ্রাম গঞ্জ হল। তারপরে গঞ্জ থেকে নগর। অমৃতসর এখন পাঞ্জাবের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহানগর।

মহানগরের মহাতীর্থে আর একটি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা এসে টাঙ্গায় উঠি। অমৃতময় অমৃতসরের জনাকীর্ণ পথ দিয়ে এগিয়ে চলি স্বর্ণমন্দিরের দিকে

"প্রণাম করুন। ইনিই নবম গুরু তেগ বাহাদুর।" বলেই সর্দারজী কুর্নিশ করেন ছবিখানিকে।

আমরা প্রণাম করি। বলি, "কিন্তু ওরা কারা?"

"কাশ্মীরি পণ্ডিত। এসেছেন গুরুজীর সঙ্গে দেখা করতে।"

"কেন?"

"আওরংজেবের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, জান ও মান বাঁচাতে।" বলতে বলতে এগিয়ে যান সর্দারজী। আমরা তাঁকে

অনুসরণ করি। কয়েক পা এগিয়ে আর একখানি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। আমরা কাছে আসতেই বললেন, "ভাল করে চেয়ে দেখুন। এই হচ্ছে সেই ছবি, যা হিন্দুস্তানে ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করেছে।"

উৎসাহিত হয়ে আমি ছবিখানির দিকে তাকাই। তাকিয়েই শিউরে উঠি। একি বীভৎস দৃশ্যের সামনে এনে সর্দারজী উপস্থিত করলেন আমাকে? এক ব্যক্তি একটি বালককে একটি ছিন্নমস্তক উপহার দিচ্ছেন। নতমস্তকে বালক সেই উপহার গ্রহন করছেন। তাহলে কি এই বালকই গুরু গোবিন্দ সিং, আর ঐ ছিন্নমস্তক তাঁর পিতা গুরু তেগ বাহাদুরের?

"শর ই খুদ দদাম, মগর সার ই খুদা ন দদাম।" সর্দারজী বিড়-বিড় করে বলে উঠলেন। আমি জানি তিনি কি বলছেন। ঐ ছিন্ন-মস্তকের শিরস্ত্রাণে এক টুকরো কাগজে লেখা ছিল এই কথা—মস্তক দান করেছি, কিন্তু ধর্ম বিসর্জন দিই নি।

এ আমরা কোথায় এলাম? তীর্থ করতে এসে যে ইতিহাসের সঙ্গে এমন মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তা তো কখনও ভাবি নি। সর্দারজীর পরামর্শে অমৃতসর পরিক্রমা শেষে স্বর্ণমন্দিরের বড় যাদুঘর দেখতে এসেছি।

টাঙ্গা থেকে নেমেই দেখেছি সর্দারজী গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাদের কাছে এসে তিনি বলেছেন, "ভালই হল, মিউজিয়াম খুলে গেছে। চলুন আপনাদের দেখিয়ে দিই।"

আগ্রহ সহকারে সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছি এই দোতলায়। সুবিশাল একখানি হলঘর। ভেবেছি মন্দিরের মিউজিয়াম—অনেক প্রাচীন মূর্তি পুঁথি ও শিলালিপি দর্শন করা যাবে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে হতাশ হয়েছি, সে-সব কিছুই নেই। দেওয়ালের গায়ে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আর বড় বড় তৈলচিত্র। মনে হয়েছে একে মিউজিয়াম না বলে আর্ট গ্যালারী বললেই তো পারে। তখন

বুঝি নি, নির্বাক ছবিগুলো এমন সবাক হয়ে উঠবে। তারা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে—১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আওরংজেব তখন হিন্দুস্থানের সম্রাট, ইফতিয়ার খান কাশ্মীরের শাসনকর্তা! সম্রাটের নির্দেশে সে সারা উপত্যকা জুড়ে কুশাসনের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের নামে অধর্মের রাজত্ব চলেছে। তরবারির মুখে ধর্মান্তকরণ ও নারী নির্যাতনই তখন রাজধর্ম। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত, দুর্গম পথ অতিক্রম করে গুহাতীর্থ অমরনাথে গমন করলেন। ধর্মান্ধ শাসকের কবল থেকে ছেলেদের জান ও মেয়েদের মান বাঁচাবার জন্যে মহেশ্বরের করুণা প্রার্থনা করলেন। করুণাময় অমরনাথ স্বপ্নাদেশ দিলেন—তোমরা আনন্দপুরে তেগ বাহাদুরের কাছে যাও। সে তোমাদের রক্ষা করবে।

আদেশ পেয়ে পাঁচশ' পণ্ডিত রওনা হলেন পাঞ্জাবের পথে। বহু কষ্টে মোগল সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁরা এলেন আনন্দপুরে। গুরু তেগ বাহাদুরের শরণাপন্ন হলেন।

তাঁদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুনে গুরুজীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু-ধারা নেমে এল। তিনি পাষাণ প্রতিমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। ঠিক এই সময় তাঁর ন'বছরের ছেলে গোবিন্দ সিং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নিশ্চল পিতা ও নির্বাক পণ্ডিতদের দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন পিতাকে—এঁরা কারা? কোথা থেকে এসেছেন?

—এঁরা উৎপীড়িত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ধর্মান্ধ শাসকের অত্যাচার থেকে মুক্তির আশায় আমার কাছে এসেছেন।

—কি উপায়ে এঁরা মুক্তি পেতে পারেন পিতা?

—কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শহীদ হতে স্বীকৃত হলে এরা মুক্তি পাবেন। একবার থামলেন তেগ বাহাদুর। তারপর চিন্তিত-ভাবে বললেন—কিন্তু কে এদের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন?

—কেন? আপনি! করজোড়ে বালক পুত্র পিতাকে নিবেদন

করলেন—আপনার চেয়ে পুণ্যবান কে আছেন, যিনি ধর্ম রক্ষার জন্য জীবন দান করতে পারেন? গোব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করার চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর কি বড় কর্তব্য থাকতে পারে পিতা?

বালক গোবিন্দ সিংয়ের বক্তব্যে বিস্মিত হলেন পণ্ডিতগণ। কিন্তু আনন্দিত হলেন পিতা। হাসিমুখে বললেন—প্রাণ বিসর্জন দিতে আমি কুণ্ঠিত নই পুত্র। কিন্তু তুমি মাত্র ন'বছরের শিশু। আমার মৃত্যুর পর তোমাকে দেখবে কে?

—সর্বশক্তিমান ভগবান! নির্ভীক পুত্র দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন।

বীর পুত্রের যোগ্য উত্তরে প্রীত হলেন পিতা। পণ্ডিতদের বললেন—আপনারা গিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তাঁকে বলুন, তিনি যদি আমাকে ধর্মান্তরিত করতে পারেন, তাহলে কাশ্মীরের সমস্ত ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হবেন।

তারপরে তেগ বাহাদুর তাঁদের একটি আবেদন-পত্রের খসড়া রচনা করে দিলেন।

সেই আবেদন-পত্র নিয়ে পণ্ডিতগণ লাহোরের শাসনকর্তা নবাব জালিমখানের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সানন্দে সেই আবেদনপত্রে দস্তখত করে সম্রাটের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

পণ্ডিতগণ নির্বিঘ্নে দিল্লী পৌঁছলেন। তারা সম্রাটের সামনে উপস্থিত হয়ে আবেদন-পত্র পেশ করলেন। পত্র পাঠ করে প্রীত হলেন আওরংজেব। একটি—মাত্র একটি লোককে ধর্মান্তরিত করতে পারলে, সমস্ত কাশ্মীরীরা ধর্মান্তরিত হবে। এত সহজে যে এত বড় কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন হতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তৎক্ষণাৎ কাজী ও মৌলবীদের ডেকে দরবার বসালেন সম্রাট। দরবার শেষে পরমানন্দে পণ্ডিতদের সর্ত মেনে নিলেন। তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে কাশ্মীরে ফিরে যেতে পারেন, তার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। কাশ্মীরীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার নির্দেশ পাঠালেন ইফতিখার খানকে। লিখলেন—আর কোন নির্যাতনের প্রয়োজন নেই।

গুরু তেগ বাহাদুরকে আমন্ত্রণ জানালেন আওরংজেব কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি সেই আমন্ত্রণ লিপি নিয়ে আনন্দপুরে পৌছবার পূর্ব্বেই তেগ বাহাদুর পাঁচজন শিষ্যসহ আগ্রা রওনা হলেন। আগ্রা পৌছলে নগর কোতোয়াল তেগ বাহাদুরকে বন্দী করে দিল্লী পাঠিয়ে দিলেন। আওরংজেব তখন দিল্লীতে ছিলেন।

সম্রাট সমীপে নীত হলেন গুরু তেগ বাহাদুর। যথারীতি আওরংজেব তাঁকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের অনুরোধ করলেন।

তেগ বাহাদুরের অট্টহাসিতে দিল্লীর দরবার কেঁপে উঠল।

সম্রাট আবার আদেশ করলেন—আপনাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে।

গুরুজী গর্জে উঠলেন—শির দিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্ম দিতে পারব না।

'তবে তোকে তাই দিতে হবে।' ক্ষুব্ধ সম্রাট ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

গুরুজী আবার হাসলেন।

আশাহত সম্রাট ঘাতককে আদেশ করলেন এই কাফেরকে নিয়ে যা এখান থেকে। প্রকাশ্য রাজপথে একে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল।

গুরুজীর মনস্কামনা পূর্ণ হল। হাসিমুখে তিনি ঘাতকের সঙ্গে চললেন। নতমস্তকে পঞ্চশিষ্য তাঁকে অনুগমন করলেন। সুযোগ বুঝে গুরুজী তাঁর প্রিয় শিষ্য ভাই জীতাকে চুপি চুপি বললেন— শিরচ্ছেদ করার পর আমার শির পৌছে দিও গোবিন্দের কাছে। একটুকরো কাগজে কিছু লিখে সেটুকু দিলেন তাঁর হাতে।

১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর। ধর্মরক্ষার জন্য শহীদ হলেন ধর্মগুরু তেগ বাহাদুর। ভাই জীতা বধ্যভূমি থেকে তাঁর ছিন্নমস্তক অপহরণ করে ছুটে চললেন আনন্দপুরে। পথেই বালক গোবিন্দ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হল। পিতার ছিন্নমস্তক পুত্রকে উপহার দিলেন

ভাই জীতা। পুত্র পরম শ্রদ্ধায় সেই উপহার গ্রহণ করলেন। অশ্রুধারার বদলে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল তাঁর দু'চোখে। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি সেই কাগজখানি পড়লেন, 'শর ই খুদ দদাম, মগর সার ই খুদা না দদাম।'

পিতার কর্তব্যভার গ্রহণ করলেন পুত্র। তবে তিনি নতুন পথে ধর্মরক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। শান্তিপ্রিয় শিষ্যদের হাতে তরবারি তুলে দিলেন গুরু গোবিন্দ। ধর্মগুরু হলেন সেনাপতি। না হলে, আজ পাঞ্জাবের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

কিন্তু না। আর ইতিহাস নয়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। মিউজিয়াম বন্ধের সময় হয়ে গেছে। সর্দারজীর সঙ্গে আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে—প্রাচীন হিন্দুস্থান থেকে বর্তমান ভারতে। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান, বৌদ্ধ-জৈন নিয়ে যে দেশ—সবার সমান অধিকার যে দেশের সংবিধানে আজ স্বীকৃত, সেই ধর্ম নিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতের মাটিতে। যে মাটির মান বাঁচাতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সর্বদা এক সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে।

ভারত আবার নতুন করে গুরুগোবিন্দের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে—দারিদ্র্য ধর্মান্ধতা ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীক্ষা। সে দীক্ষা বিফল হয় নি, এ দীক্ষাও বিফল হবে না। অতএব এসো, আমরাও আজ সমবেত স্বরে বলে উঠি—'গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়…'

সতী-বিরহে কাতর সতীনাথের কোন কাজে মন নেই। তিনি কেবল ধ্যান করেই চলেছেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে দেবগণ অস্থির হয়ে উঠেছেন। মহাদেবের পুত্র ছাড়া আর কেউ তারকাসুরকে বধ করতে পারবেন না। অতএব মহাদেবের আবার বিয়ে করা দরকার। কিন্তু ধূর্জটি তো সেই যে ধ্যানে বসেছেন, আর ওঠবার নামটি করছেন না। তাই দেবতারা মদনকে পাঠালেন তাঁর ধ্যান-ভঙ্গ করতে।

মদন এসে দেখেন একটি দেবদারু গাছের ছায়ায় বাঘ-ছাল বিছিয়ে ধ্যানে বসেছেন মহাদেব। তাঁর মাথায় সাপের জটা। তাঁর দেহ স্থির। কেবল তৃতীয় নয়ন থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। মদন ভয় পেলেন। তাঁর হাত থেকে ফুলধনু ও ফুলশর খসে পড়ল।

ঠিক তখনই দু'জন সখীর সঙ্গে দশদিক আলো করে হিমালয় দুহিতা পার্বতী উপস্থিত হলেন সেখানে। পার্বতী মনে মনে মহাদেবকে ভালোবাসেন। মদনের মনে সাহস ফিরে এল। তিনি ধনু ও শর তুলে নিলেন হাতে। উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ধূর্জটির ধ্যান ভঙ্গ হল। পার্বতী তাঁকে প্রণাম করলেন। মহাদেব আশীর্বাদ করলেন এমন পতি লাভ কর, যার অন্য কামিনীর প্রতি মতি থাকবে না।

সুযোগ বুঝে রতিপতি মদন শিবকে সম্মোহন শর নিক্ষেপ করলেন। আর তখনই শিবের নজর পড়ল মদনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন বেরিয়ে মদনকে ভস্মীভূত করে ফেলল। পার্বতী পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। মদনপত্নী রতি ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন সেখানে।

পলাতকা পার্বতী বুঝতে পারলেন সৌন্দর্যের মোহ বিছিয়ে শিবের মন জয় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি তপস্যাচারী শিবকে জয় করার জন্য তপস্যায় বসলেন। ভূমি হল তাঁর শয্যা, বৃষ্টির জল হল তাঁর পানীয় আর চাঁদের সুধা হল তাঁর খাদ্য। গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার ধারা আর শীতের তুষারকে উপেক্ষা করে তিনি তপস্যারতা রইলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়। একদিন পার্বতীর তপোবনে এসে উপস্থিত হলেন একজন প্রিয়দর্শন যুবক। পার্বতী পরম শ্রদ্ধায় সেই অতিথিকে বরণ করলেন।

অতিথি উমাকে বললেন---তোমার বয়সের কোন মেয়েকে আমি এমন কঠোর তপস্যা করতে দেখি নি। কিন্তু মুনিঋষিদের অসাধ্য এই তপস্যা তুমি কেন করছ! তোমার দেহে শোকের কোন চিহ্ন নেই, তোমার তো কোন অভাব নেই। তাহলে কেন তোমার এই তপস্যা? কি তোমার প্রার্থনা?

---আমি মহেশকে পতিরূপে লাভ করতে চাই।

—ছি ছি, তুমি শেষে ক্ষুদ্রমতি ভূতনাথের গলায় মালা দিতে চাও। সেটা যে একটা বুড়ো ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। গায়ে ছাই মাখে, গলায় দেয় হাড়ের মালা। তার মাথায় সাপ আর পরনে বাঘের ছাল। কি দেখে তাকে তুমি পছন্দ করলে?

অতিথির কথায় উমা রেগে গিয়ে বললেন---তুমি মূর্খ। মহেশ্বরের প্রকৃত পরিচয় জানো না। আর যারা মহাপুরুষদের নিন্দা করে, তারা মহা পাপী। তাদের কাছে থাকাও পাপ। পার্বতী সেখান থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

অতিথি তাঁকে বাধা দিলেন। তাঁর ছদ্মবেশ খসে পড়ল।

পরম বিস্ময়ে উমা দেখলেন, পরমারাধ্য মহাদেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর সামনে।

অভিভূতা পার্বতী আনতা হয়ে শিবকে প্রণাম করতে গেলেন।

শঙ্কর তাঁকে বাধা দিলেন। সহাস্যে শঙ্করীকে বললেন—তোমার তপস্যা সার্থক হল।

তারপরে……।

কিন্তু এ সব কি ভেবে চলেছি আমি। নাগপুরের কথা বলতে বসে আমি 'কুমার-সম্ভব'-এর কাহিনী বলছি কেন? বিদর্ভের কেন্দ্র-ভূমি নাগপুরে এসে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কারণ 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং' রামগিরি আশ্রম নাগপুরের অনতি দূরে অবস্থিত।

কিন্তু সে তো 'মেঘদূত'। মেঘদূতের কথা মনে না করে আমি কুমারসম্ভবের কাহিনী ভেবে চলেছি কেন? কুমারসম্ভবের সঙ্গে নাগপুরের সম্পর্ক কী?

আছে। সেই কথাই বলছি এখন। বিয়ের পরে মাসখানেক হিমালয়-প্রাসাদে কাটিয়ে হর-পার্বতী চললেন কৈলাসে। পথে পার্বতী কৃত্তিকার গর্ভে জন্ম মহাদেবের পুত্র কার্তিককে কুড়িয়ে পেলেন। তাকে নিয়ে তাঁরা গেলেন কৈলাসধামে। পার্বতী পরমস্নেহে পুত্রকে লালন-পালন করতে থাকলেন। কিছুকালের মধ্যেই কুমার কার্তিক নবযৌবন প্রাপ্ত হয়ে সব শস্ত্র ও শাস্ত্রে বিশারদ হয়ে উঠলেন।

এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে স্বর্গে তখন দেবতাদের বড়ই দুরবস্থা। নিরুপায় ইন্দ্র এলেন হর-পার্বতীর কাছে। তারকাসুরকে বধ করার জন্য তিনি কুমার কার্তিককে প্রার্থনা করলেন। হর-পার্বতী সানন্দে সম্মত হলেন। মহাদেব কুমারকে বললেন—তুমি তারকাসুরকে বধ করে দেবতাদের মঙ্গলসাধন কর।

পার্বতী পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন—শত্রু নিপাত করে স্বর্গে শান্তি আনো।

পিতা-মাতাকে প্রণাম করে কুমার কার্তিক ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে যাত্রা করলেন।

ব্যস, আর নয়। নাগপুরের প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের কেবল এই

অংশটুকু প্রয়োজন আছে। বলাই বাহুল্য কুমার অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তারকাসুরকে বধ করে স্বর্গে শান্তি এনেছিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধ জয়ের কাহিনী এখন থাক। তার চেয়ে বরং যে কাহিনী শুনেছি জনৈক প্রাচীন নাগপুরবাসীর কাছে, সেইটুকু বলছি। এ কাহিনী এখানকার সুপ্রাচীন জনশ্রুতি।

কুমারকে দেবতাদের হাতে স্বেচ্ছায় সঁপে দিয়েছেন হর-পার্বতী। কিন্তু কার্তিক চলে যাবার পরে তাঁদের আর দিন কাটতে চায় না। সর্বদা কেবল কার্তিকের কথাই মনে পড়ে। কৈলাসের প্রতি পাথরে পাথরে জড়িয়ে আছে কুমারের স্মৃতি। পিতা-মাতা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন পুত্রের জন্য। কার্তিকহীন কৈলাসকে তাঁদের কারাগার বলে মনে হতে লাগল। অবশেষে তাঁরা ভাবলেন, কিছুকাল মর্ত্যে বিচরণ করে আসা যাক। দেশ-ভ্রমণও হবে আবার কার্তিকের কথাও ভুলে থাকা যাবে।

হরপার্বতী মর্তে এলেন। উত্তরাপথ পেরিয়ে পৌঁছলেন দণ্ডকারণ্যে। দণ্ডকবনের অসীম অনন্ত ও উদার প্রকৃতি মহাদেবকে উন্মনা করে তুলল। পার্বতীকে একটু বসতে বলে তিনি ধ্যানে বসলেন। সময় কাটাবার জন্য পার্বতী মাটির পুতুল তৈরি করতে থাকলেন। বারো বছর বাদে মহাদেবের ধ্যান ভাঙল। পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব সেই মাটির মানুষদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই মাটির মানুষদের বংশধররাই নাকি মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে কুড়মী বা কুণবী জাতি বলে পরিচিত। বৃদ্ধ কুণবীরা এখনও তাঁদের উৎপত্তির এই ইতিহাসে বিশ্বাসী।

নাগপুরের প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে কুণবীরাই অধিকাংশ। এখন তাঁরা সবার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কিন্তু কিছুকাল আগেও তাঁদের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যেমন প্রতি দশ-বারো বছর বাদে বৃহস্পতি যখন সিংহ রাশিতে যায়, তখনই কেবল কুণবীদের বিয়ে হত। ফলে এ সময় শিশু থেকে যুবতী পর্যন্ত

কোন বাছ-বিচার না করে সব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। যদি কোন কুমারীর বর জোটানো না যেত, তাহলে তার বিয়ে হত একটি ফুলের সঙ্গে। বিয়ের পরে ফুলটিকে জলে ফেলে দেওয়ায় বরের মৃত্যু ঘটত, আর কনে হত বিধবা। সুবিধামত পরে সেই বিধবা মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করা হত। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে বিয়ে ভেঙে যেত। তারা দেখে শুনে দ্বিতীয়বার বিয়ে করত। দ্বিতীয় বিয়ে বা বিধবা বিবাহের জন্য কোন সময়ের বাছ-বিচার ছিল না। যে কোন সময়ে সে বিয়ে হতে পারত। এখন প্রথম নিয়মটি প্রায় উঠে গেছে। কিন্তু বিধবা বিবাহ আজও চালু আছে কুণবীদের মধ্যে।

সেকালে দ্বিতীয় বিয়েতেও কিন্তু কম ধুমধাম হত না। গাঁটছড়া বেঁধে বর-কনে ঘোড়ায় চড়ে, শোভাযাত্রা সহকারে, গান-বাজনার মধ্যে বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করত। গণেশ পুজো করে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হত।

কুণবীরা বীর জাতি। তাঁরা অতিশয় শ্রমশীল ও সাহসী। গোয়ালিয়র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রণজী-সিন্ধিয়া কুণবী বংশীয় বীর ছিলেন। আপন অধ্যবসায় ও বীরত্বে তিনি সাধারণ সৈনিক থেকে বালাজী পেশওয়ার প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

নাগপুরের আদি-অধিবাসীদের প্রসঙ্গে আরেকটি জাতির কথা বলা প্রয়োজন। সে জাতির নাম গোঁড়জাতি। এরা গোণ্ড নামেও পরিচিত। অনেকে বলেন এরা পাহাড়ী, আবার অনেকে বলেন এরা গৌড় দেশীয় অর্থাৎ বাঙালী। শেষের মতটি গ্রহণ করাই ভাল। কারণ তাহলে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হয়ে যায়।

গোঁড়দের আচার-বিচার রাজপুতদের মতো। এদের মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবারা সাধারণত দেওরকে বিয়ে করে থাকে। এরা পুরুষের মৃতদেহ সৎকার করে কিন্তু মেয়েদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

পুরাকালে গোণ্ডরাজ্যকে গোণ্ডবন বলা হত। গড় ও মণ্ডল নামে

এই রাজ্যের দুটি বিখ্যাত রাজধানী ছিল। দলপৎসা নামে একজন বীর যুবক তখন গড়রাজ্যের রাজা। তিনি হামিরপুর জেলার মহোবানগরের রাজকন্যা দুর্গাবতীর রূপ-গুণের কথা শুনে তাকে ভালোবেসে ফেললেন। দুর্গাবতীর পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। দলপৎসা মহোবানগর আক্রমণ করে দুর্গাবতীকে জয় করে নিয়ে এলেন। তিন বছর তাঁরা সুখে রাজত্ব করলেন। তারপরে দলপৎসার অকাল মৃত্যু হয়। স্বামীর অবর্তমানে রানী দুর্গাবতী রাজ্যশাসন করতে থাকলেন। সুযোগ বুঝে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি আসফখাঁ গড়রাজ্য আক্রমণ করে। সে যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে রানী দুর্গাবতী ও তাঁর পুত্র বীরনারায়ণ প্রাণত্যাগ করেন।

দুর্গাবতীর পরেই আসে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা। নাগপুরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে আছে তাঁর পুণ্যস্মৃতি। শহরের কেন্দ্র-স্থলে রয়েছে তাঁর প্রতিমূর্তি। নিকটস্থ অঞ্চলের নাম রানী ঝান্সী স্কোয়ার। এখান থেকেই আজ আমাদের যাত্রা হবে শুরু। আমরা নাগপুর পরিক্রমা শুরু করছি। কিন্তু তার আগে আর একবার অতীতকে স্মরণ করে নিতে চাই।

রামায়ণের যুগে গোদাবরীর তীর থেকে পঞ্চবটী বন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দণ্ডকারণ্য ও জনস্থান নামে পরিচিত ছিল। আদিকবি বাল্মীকির মতে—সূর্যবংশীয় রাজপুত্র দণ্ড শুক্রাচার্যের সুন্দরী কন্যা অরজাকে দেখে কামাসক্ত হয়। কিন্তু অরজা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কামান্ধ দণ্ড তখন একদিন অরজাকে একাকিনী পেয়ে জোর করে তার সতীত্ব নষ্ট করে। অরজা পিতার কাছে দণ্ডের এই কুকীর্তির কথা বলে দেয়। ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য দণ্ডকে অভিশাপ দেন, সে সপরিবারে ধ্বংস হবে। সাতরাত ও সাতদিনের মধ্যে দণ্ডরাজ্য অরণ্যে পরিণত হবে। তারপরে শুক্রাচার্য তাঁর আশ্রমবাসীদের দণ্ডরাজ্যের বাইরে গিয়ে বাস করার পরামর্শ দেন। ফলে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে অবস্থিত

দণ্ডরাজ্যের নাম হয় দণ্ডকারণ্য। আর আশ্রমবাসীদের নতুন বসতি জনস্থান নামে পরিচিত হয়।

সেকালের দণ্ডকারণ্যের এক অংশই এখন নাগপুর। কালিদাসের কালেও এ অঞ্চলে জনবসতি ছিল বলে মনে হয় না। কারণ কর্তব্যচ্যুতির জন্য যক্ষকে দেবদারু বনময় রামগিরিতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। মনে হয় কাব্যের প্রয়োজনে মহাকবি মনুষ্যবর্জিত সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য অতিক্রম করে রামগিরি গিয়েছিলেন। না হলে অমন বর্ণনা অসম্ভব। ধন্য কবি কালিদাস!

দক্ষিণ-পূর্ব-রেলের বৃহত্তম রেলস্টেশন নাগপুর। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি টাঙ্গা ও রিকশার জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সামনের রাস্তাটি তেমন বড় নয়। স্টেশনের বাঁ দিকে ওভার-ব্রিজ। ওপারে বাজার ও প্রাচীন প্রাসাদ।

স্টেশন থেকে রানী ঝান্সী স্কোয়ারে আসার পথে ডানদিকে সীতাবল্‌ডী দুর্গ—ছোট একটি পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশে সীতাবল্‌ডী বাজার—নাগপুরের বড় বাজার। আরও কয়েকটি বাজার আছে নাগপুরে। এদের মধ্যে ইতোয়ারী বাজার, মঙ্গলবাজারী ও বুধওয়ারী বাজার বিখ্যাত।

রানী ঝান্সী স্কোয়ার থেকে চারটি পথ গেছে শহরের চারদিকে। একটি গেছে মহারাজবাগের দিকে। মহারাজার প্রতিপত্তি কমেছে, কিন্তু মহারাজবাগ দিন দিন উন্নত হচ্ছে। এই মহারাজবাগেই নাগপুরের চিড়িয়াখানা। আয়তনে ছোট। কয়েকটি মাত্র বাঘ সিংহ ও হরিণ আর কিছু পশুপক্ষী নিয়ে এই চিড়িয়াখানা। তবু কিছুক্ষণ কাটাতে ভাল লাগে। মহারাজবাগেই নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি মহাবিদ্যালয়।

নাগপুর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল। সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে ১৯৬০ সাল থেকে নাগপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই এখানে রয়েছে রাজভবন সেক্রেটারিয়েট এসেম্বলী হাউস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক,

হাইকোর্ট ও বড় বড় কয়েকটি বিশ্রাম-ভবন। আছে নক্করখানা বা সংগীত ভবন, হিস্‌লপ কলেজ (১৮৮৩) ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল টেকনিক্যাল কলেজ। আর আছে একটি যাতুঘর—শহরের প্রান্তে, মরিস কলেজের সামনে। যাতুঘরের সামনে ডক্টর বি. আর আম্বেদকরের একটি প্রতিমূর্তি আছে।

নাগপুর ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই বহু বিখ্যাত সর্ব-ভারতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে। এই সব অধিবেশনের মধ্যে ১৮৯১, ১৯২০ ও ১৯৫৯ সালের জাতীয় কংগ্রেস, ১৯২০, ১৯৩১ ও ১৯৪৫ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেস, ১৯৪৩ সালের সড়ক কংগ্রেস ও ১৯৬৬ সালের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা রয়েছি বড় পোস্ট অফিসের পাশে—প্রাক্তন এম. এল. এ. হোস্টেলে। সে অঞ্চলের রাস্তাগুলি ভারী সুন্দর। যেমন মসৃণ তেমনি প্রশস্ত ও ছায়াশীতল।

তিনখানি রিকশা ও তু'খানি সাইকেলে করে আমরা চলেছি নাগপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান আমবাজারী। স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিশাল একটি কৃত্রিম হ্রদ আমবাজারী। হ্রদের ওপারে বিমানক্ষেত্র। নাগপুর ভারতের কেন্দ্রস্থলে। কাজেই বিমান পরিবহনে এই বিমানক্ষেত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিমানক্ষেত্রের পেছনে কয়েকটি টিলা আছে। টিলার ওপর দিয়ে পথ তৈরি হয়েছে। এই পথের ওপর দাঁড়িয়ে নাগপুরকে বড়ই সুন্দর দেখায়।

হ্রদের তীরে বাঁধানো পথ। গাছের ছায়ায় বসবার জায়গা। তারপরে বাগান। বাগানের শেষে বন। বাগানটি বড় সুন্দর। চড়ুইভাতির আদর্শস্থান আমবাজারী। দূর্বা ছাওয়া সবুজ প্রান্তর আর নানা বর্ণের বিচিত্রসুন্দর অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে চারিদিকে। উদ্যানে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট একটি অংশ আছে। সেখানে আছে

বিবিধ খেলার বন্দোবস্ত। আছে একটি ঝুলন্ত পুল। পার হবার সময় দুলতে থাকে। ভাল লাগে, ভয়ও করে।

আমবাজারী থেকে আমরা এলাম তেলেংখাড়ী। ডাল হ্রদের তীরে অবস্থিত শ্রীনগরের উদ্যানসমূহের অনুকরণে নির্মিত। বলা বাহুল্য তাদের মতো প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী নয়। চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা। গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সামনে খানিকটা পাথর বাঁধানো আঙ্গিনা। উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে সঙ্কীর্ণ কিন্তু সুদীর্ঘ জলাশয়। দু'পাশে পথ। পথের পাশে সবুজ প্রান্তর ও বাগান। বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন লেগেছে। আগুনের পরশ লাগে আমাদের মনে। আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়ে আমরা ফিরে চলি আস্তানায়।

নাগপুর পরিক্রমা পূর্ণ হল, কিন্তু সমাপ্ত হল না নাগপুরের কাহিনী। নাগপুরের প্রবাসী বাঙালীদের কথা না বললে নাগপুরের কথা অপূর্ণ থেকে যায়। ১৮৫৫ সাল থেকে এ শহরে বাঙালীরা আসছেন। এখন এখানে অন্তত দশ হাজার বাঙালী স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বাঙালীরা এসেছেন জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে। কিন্তু তাঁরা কেবল অফিস আদালত দিয়েই জীবনটাকে ভরিয়ে রাখেন নি। সেই সঙ্গে নিজেদের আন্তরিকতা দিয়ে নাগপুরকেও আপন করে নিয়েছেন। নাগপুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারসাধনে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথম বলতে হয় দীননাথ স্কুল, মরিস কলেজ (নাগপুর মহাবিদ্যালয়) ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসুর কথা। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। নাগপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষও বাঙালী—কর্নেল বসু।

স্থানীয় বাঙালীদের আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এখানে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এই সম্মেলন আয়োজিত হলেও এটি পশ্চিম

বাংলার বাঙালীদের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালী ও অবাঙালীদের মিলনোৎসব। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন নাগপুরে সেই প্রথম নয়। আরও একবার এখানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২৯ সালের সেই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল-সভাপতি ছিলেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

নাগপুর বাণী নামে একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এখানে। নাগপুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় বাঙালীদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা নাগপুরের সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছেন। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সেবাগ্রাম

গান্ধীজীর স্মৃতি-বিজড়িত সেবাগ্রাম। আমরা দর্শন করতে চলেছি। আমি ও কাকা (শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীসুমথনাথ ঘোষ)। নাগপুরের ছেলে শ্রীমান মনোজ ঘোষ ও পশুপতি তরফদার চলেছে আমাদের সঙ্গে। ওরা আমাদের চরণদার। দর্শন শেষে আজ রাত্রেই আমরা ফিরে আসব নাগপুর।

গাড়ি ছাড়ার পরে আলাপ হল ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের সঙ্গে। স্ত্রী ও ছোট ভাইকে নিয়ে তিনিও সেবাগ্রাম চলেছেন। ডাঃ পাল একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন সহ-অধ্যক্ষ। দেশ ভ্রমণের নেশা তাঁর প্রবল। দেশেবিদেশে বহু ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু ভ্রমণের নেশা কাটে নি। এ নেশা যে জবর নেশা। একবার হলে আর কখনও কাটে না।

আমরা ওয়ার্ধা নেমে সেবাগ্রাম যাব। নাগপুর থেকে ওয়ার্ধা ৪৮ মাইল। মেল কিংবা এক্‌সপ্রেস ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। কলকাতা থেকে নাগপুর ৭০৭ মাইল।

রেলপথের দু পাশে ক্ষেত। কোথাও বা ফসল আছে, কোথাও নেই। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ে ভরা বন্ধ্যাভূমি। এখানে ওখানে দুয়েকটি তেঁতুল, নিম কিংবা খেজুর গাছ। কোথাও কমলালেবুর বাগান। দূরে বহু দূরে, ধূসর পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা রেখা। পাহাড় বন ক্ষেত পেরিয়ে বম্বে এক্সপ্রেস চলেছে ছুটে। চলেছে আমাদের নিয়ে নাগপুর থেকে ওয়ার্ধা।

ওয়ার্ধা বেশ বড় স্টেশন। ওভার ব্রিজ পেরিয়ে বাইরে এলাম। টাঙ্গা ও রিক্‌সাওয়ালারা ঘেরাও করল আমাদের। চার টাকা করে সেবাগ্রাম আসা যাওয়া ঠিক হল দু'জন টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে। কিন্তু টাঙ্গায় উঠতে গিয়ে বাধা পেলাম। ওরা নাকি তিনজনের বেশি নেবে

না এক টাঙ্গায়। আমরা সাতজন, কাজেই তিনখানি টাঙ্গা নিতে হবে। জীবনে বহুবার বহু জায়গায় টাঙ্গায় চড়েছি। সর্বত্র দেখেছি টাঙ্গা অন্তত চারজন আরোহী বহন করে থাকে। স্বভাবতঃই ওদের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হতে হল। কলহটা বোধ হয় ওরা ভাড়ার ফাউ বলে হিসেব করে থাকে। কলহ না হলে কম ভাড়া পাবার বেদনা পীড়া দেয় ওদের। তাই কিছুক্ষণ কলহের পরে আমাদের টাঙ্গা চলতে শুরু করল।

মফঃস্বল শহরের বাঁধানো পথ। দুদিকে সারি সারি দোকান বাড়ি-ঘর অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ সিনেমা বিশ্রাম-ভবন ও পাঠাগার। এক কথায় জেলা-সদরের সব উপকরণ আছে এখানে। কিছুদূর এসে একটি ছোট পুল। পুলের পরে ফার্লং খানেক এগিয়ে আমরা ডান দিকের পথ ধরে পূর্বে অর্থাৎ নাগপুরের দিকে এগিয়ে চললাম। নাগপুর থেকে ওয়ার্ধা ৪৮ মাইল। সেবাগ্রাম ওয়ার্ধা থেকে ৪ মাইল। অর্থাৎ সেবাগ্রাম নাগপুর থেকে ৪৪ মাইল। সেবাগ্রামেও রেল স্টেশন আছে। ১৯৫৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের সময় অনেক প্রতিনিধি এসে সেবাগ্রাম আশ্রমে ছিলেন। তাঁদের প্রয়োজনে সেবাগ্রামে নূতন স্টেশন করা হয়েছিল। সে স্টেশন আজও আছে, কিন্তু সেখানে কোন এক্সপ্রেস কিংবা মেল ট্রেন থামে না। তাই আমাদের ট্রেনে ৪ মাইল এগিয়ে আবার টাঙ্গায় ৪ মাইল পেছুতে হচ্ছে। তবে যাবার সময় আমরা সেবাগ্রাম স্টেশন থেকেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে নাগপুরে ফিরে যাব।

হঠাৎ পথের পাশে 'মহিলা সেবাশ্রমের' সাইনবোর্ড দেখে 'থামো থামো' বলে চীৎকার করে উঠলেন মিসেস পাল। কিন্তু যাকে থামতে বলা, তার থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কারণ ভাষা বিভ্রাটের জন্য সে মিসেস পালের অনুরোধ অনুধাবন করতে পারে নি। বাধ্য হয়ে আমাদের কথা বলতে হয়। মহিলা যখন সঙ্গে আছেন, তখন মহিলা সেবাশ্রম দর্শন না করে উপায় নেই।

মহিলা-সেবাশ্রম 'মহিলা সেবা-মণ্ডলে'র সদর দপ্তর। আমরা সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। সুরকির প্রশস্ত পথ। দুদিকে সারি সারি গাছ। একটু এগিয়ে পথটি এসে মিশেছে আরেকটি পথে! পথের পাশে বেশ দূরে দূরে ছোট-বড় বাড়ি—স্কুল কলেজ হস্টেল অফিস কিচেন ও কোয়ারটার্স।

স্কুলের বাড়িটি বিরাট। বিশাল একটা হলঘরে সারি বেঁধে বসে বহু মেয়ে একসঙ্গে চরকা কাটছে। ভাল লাগল এই সমবেত চরকা কাটা। দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

তারপরে এলাম অফিসে। আলাপ হল বাংলার মেয়ে শ্রীমতী উষা পুরকায়স্থর সঙ্গে। ছোটখাটো রোগা চেহারা। আদি নিবাস ছিল সিলেট। বঙ্গ বিভাগের পরে এখানে এসেছেন। সেই থেকে এখানে আছেন। ভদ্রমহিলা শিল্পী—ফাইন আর্টসের টিচার। আমাদের নিয়ে এলেন তাঁর ক্লাস রুমে। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে তাঁর আঁকা কয়েকখানি ছবি। কোনখানি গাছের পাতার রস দিয়ে আঁকা, কোনখানি রঙিন মাটি দিয়ে, কোনখানি কাজল দিয়ে। সদাহাস্যময়ী শিল্পী উষাদেবীকে ভাল লাগল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এই আশ্রমের ইতিহাস।

তিনি সানন্দে শুরু করলেন—১৯২৪ সালে এই মহিলা-মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'হিন্দু মহিলা মণ্ডল।' পরবর্তীকালে গান্ধীজীর প্রভাবে এই মণ্ডল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় মহিলা সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আগে এই মণ্ডল কেবল অন্যান্য মহিলা সেবাশ্রমকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু ১৯৩৩ সাল থেকে এখানেও সেবাকার্য শুরু হয়েছে।

১৯৩৩ সালে আচার্য বিনোবা ভাবে এখানে 'কন্যা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। সে বছরই গান্ধীজী 'সবরমতী আশ্রম' বন্ধ করে দেন। বিনোবাজীর আমন্ত্রণে সেখানকার শিক্ষার্থিনীরা চলে আসেন এখানে। এইভাবে বছর দুয়েকের মধ্যেই কন্যা-আশ্রম মহিলা

সেবাশ্রমে পরিণত হয়। গান্ধীশিষ্য যমুনালালজী আর্থিক সাহায্য করেন বিনোবাজীকে। কাকাসাহেব কালেকর, কৃষ্ণদাসজী যাজু ও কিশোরীলালজী মাশরুয়ালা প্রমুখ পণ্ডিত ও সমাজসেবীগণ তাঁদের সাহায্য করার জন্য এখানে চলে আসেন। সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নত হতে থাকে।

১৯৪৮ সাল থেকে বিনোবাজীর নেতৃত্বে এই আশ্রমে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের প্রচলন হয়। সেই থেকে এখানে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষার সঙ্গে চরকা কাটা, তাঁত বোনা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানকার ছাত্রীরা স্বাবলম্বী। রান্না থেকে চাষাবাদ পর্যন্ত সবই তাদের করতে হয়।

বর্তমানে মহিলা সেবাশ্রম চারটি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন—উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, বুনিয়াদি ও বাল-মন্দির বা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারীদের পরিবার পরিজনকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় এখানে। এখানকার সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মীরা বিয়াল্লিশের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বিপ্লবের সময় এই আশ্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে বিপ্লবীরা মুক্তিলাভ করার পর পুনরায় প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে।

দর্শন শেষে উষাদেবীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি পথে। টাঙ্গায় চড়ে এগিয়ে চলি গান্ধীতীর্থ সেবাগ্রামের দিকে।

পিচ-ঢালা পথ দিয়ে টগ্‌বগ্‌ করে টাঙ্গা চলেছে ছুটে। পথের দুধারে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। ডাক্তার পাল, কাকা, আমি ও পশুপতি রয়েছি এক টাঙ্গায়। ডাক্তার পাল তাঁর জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলছেন কাকাকে। ডাক্তার পালের কথা কানে আসছে ভেসে। তিনি বলছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা। ডাক্তারী পাস করে ডাক্তার পাল একদিন বিজ্ঞান কলেজে আচার্য রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। নিজের পরিচয় দিলেন ডাক্তার

পাল। আনন্দিত আচার্য তাঁকে বসতে বললেন। ঘটনাচক্রে ঠিক তখুনি গবেষণাগার থেকে একটি ছেলে ছুটে এল সেখানে। গবেষণা-রত একটি ছাত্রের হাত কেটে গেছে। রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না। ছাত্রটি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। শোনা মাত্র আচার্য উঠে দাঁড়ালেন। ধমক দিলেন ডাক্তার পালকে—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস? তুই না ডাক্তার! তাড়াতাড়ি ছুটে যা। ছেলেটিকে বাঁচা।

ডাক্তার পাল তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন ভেতরে। ছেলেটির হাত থেকে কাচের টুকরোগুলো বের করে, হাত সেলাই করে দিলেন। রক্ত বন্ধ হবার পরে ছেলেটি সুস্থ হলে, তিনি ফিরে এলেন আচার্যের কাছে।

খুশিতে উপচে পড়লেন আচার্যদেব। পিঠে একটা কিল মেরে হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার পালকে—সাবাস ডাক্তার, সাবাস! তোকে আমার একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত।

ডাক্তার সহাস্যে বললেন—বেশ তো, দিন।

—নারে যা দিতে ইচ্ছে করছে, তা যে দিতে পারছি না।

বিস্মিত ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—কি সে পুরস্কার?

—আমার নাতনী থাকলে, তোর সঙ্গে আমি তার বিয়ে দিতাম।

তারপরে আচার্যের সঙ্গে ডাক্তার পালের দেখা হয় ১৯৩৭ সালে—প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনের সময়। অধিবেশনের মূল সভাপতি আচার্যদেব আর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাক্তার পাল। তিনি সস্ত্রীক সেবারে পাটনায় গিয়েছিলেন। দেখা হওয়ার পরে দুজনে প্রণাম করলেন আচার্যদেবকে। পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন আচার্যদেব। ডাক্তার পাল তাঁকে সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আচার্যদেব শ্রীমতী পালের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ডাক্তার পালকে বললেন—ভাগ্যিস সেদিন আমি তোকে পুরস্কৃত করতে পারি নি। পারলে তো আজ নাতবৌকে নিয়ে আসতে পারতিস না এখানে।

হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন ডাক্তার পাল—কিন্তু আপনি না দিলেই কি আমি আপনার পুরস্কার ছেড়ে দিতে পারি? আপনাকে না জানিয়েই আমি সে পুরস্কার নিয়ে নিয়েছি।

বিস্মিত কণ্ঠে আচার্যদেব বললেন—মানে?

স্ত্রীকে দেখিয়ে ডাক্তার পাল জবাব দিলেন—এ আপনার নাতবৌ নয়, নাতনী।

—সে কিরে, কার মেয়ে তুই?

শ্রীমতী পাল পিতার নাম বললে, উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লেন আচার্যদেব। ডাক্তার পালকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলেন—অরে দুষ্টু ছেলে, আমাকে না জানিয়ে আমার নাতনীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিস তুই। ভারী খুশি হলাম শুনে। আশীর্বাদ করি, সুখে থাক তোরা।

সুখেই আছেন ডাক্তার পাল।

এমনি একটির পর একটি সত্যকাহিনী বলে যেতে থাকলেন ডাক্তার পাল। বললেন পেশোয়ার বিলেত ব্যাঙ্কক ও রাশিয়ার মানুষদের কথা। অজস্র বিচিত্র সুন্দর অভিজ্ঞতার সাক্ষী তিনি। কাজেই তাঁর কাহিনী শেষ হবার আগেই আমাদের পথ ফুরিয়ে গেল। আশ্রমের সামনে এসে থামল আমাদের টাঙ্গা। গেটের ওপরে ইংরেজীতে লেখা—সেবাগ্রাম আশ্রম।

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আশ্রম। ছোট বড় কয়েকটি কুটির—কাঠ পাথর টালি ও বাঁশের ঘর। ছায়াশীতল আঙ্গিনা ও ধূলিমাখা পথ। এখানে ওখানে ছোট-ছোট ফুলবন। আশ্রমের শেষে শস্যক্ষেত্র। আশ্রমবাসীরা খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী নন। চাষাবাদ করে ও সুতো কেটে খদ্দর বুনে এরা নিজেদের খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করে থাকেন। আজ পর্যন্ত এরা রেশনকার্ডের জন্য খাদ্য দপ্তরের কাছে দরবার করেন নি। সে কালের মুনি-ঋষিদের আশ্রম সম্পর্কে মানস-পটে যেমন ছবি আঁকা আছে, তার সঙ্গে যেন সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে।

জগতের যে কোন স্থান থেকে যে কেউ এসে অতিথি হতে পারেন সেবাগ্রাম আশ্রমে। বিনা ভাড়ায় বাস করতে পারেন বিশ্রামভবনে। তবে খাবারের জন্য দৈনিক চার ঘণ্টা শ্রমদান করতে হবে। আশ্রম-বাসীদের সঙ্গে সাধ্যানুযায়ী ক্ষেতে কিংবা বাগানে কাজ করতে হয়। কাজ না করতে পারলে পাশে দাঁড়িয়ে কাজ দেখতে হয়।

একদিকে কস্তুরবা সেবাসদন আরেকদিকে বাপুজী আশ্রম। সেবা-সদনটি প্রসূতি সেবাপ্রতিষ্ঠান। আমরা আশ্রমে প্রবেশ করি, প্রথমেই ডান দিকে পুস্তকালয়। তারপর আদি নিবাস, বাপু কুটি, বা কুটি (কস্তুরবা গান্ধীর কুটির), আখিরী নিবাস, উপাসনা ভূমি, রন্ধন ও ভোজনশালা, কুয়ো গোশালা মহাদেব কুটি, কিশোরীলাল নিবাস, পারচুরে কুটি, রুস্তম ভবন ও বিশ্রাম ভবন। সব কুটিরেই টালির চাল, পাথরের মেঝে ও দেওয়াল। দুয়েকটিতে বাঁশের বেড়াও আছে। কোনটি বড়, কোনটি ছোট। গড়ন সব একই রকম।

আমরা বাপুজীর শোবার ঘরে এসে দাঁড়াই। অতি সাধারণ ঘর ও আসবাবপত্র। একখানি করে বাঁশের খাট, মাদুর ও টেবিল। টেবিলে গান্ধীজীর ব্যবহৃত কলম দোয়াত চশমা প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত। বিছানাটি কাচ দিয়ে ঢাকা রয়েছে। মাথার বালিসের উপরে 'ওঁ' লেখা। ঘরের মেঝেতেও লেখা রয়েছে 'ওঁ'।

শোবার ঘরের একপাশে রান্না ঘর, আরেক পাশে একখানি হল-ঘর। এই হলঘরে দিনে দপ্তর বসত, সন্ধ্যায় প্রার্থনা হত। ভারত-বরেণ্য ব্যক্তিরা হামেশাই আসতেন এ ঘরে। তাঁদের পদধূলি আজও মিশে আছে সেবাগ্রামের পথে পথে।

সেবাগ্রাম এই রকমই ছিল সেকালে, এই রকমই থাকবে সে চিরকাল। তাই সেই মহান অতীতের স্পর্শ পাওয়া যাবে সেবাগ্রামে, যে অতীত ভারতের সনাতন সভ্যতার ধারক। জগতের কত পরিবর্তন হল, ভারতের কত পরিবর্তন হল কিন্তু সেবাগ্রাম রইল ঠিক তেমনি। এ এক পরমাশ্চর্য বৈ কি ? আশ্চর্য তো ছিলেন সেই মানুষটিও। তাঁর

সঙ্গে মতের অমিল ঘটতে পারে, পথের অমিল হতে পারে, কিন্তু তিনি যে একজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, তাতে কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সেবাগ্রামকেও যে সবার ভাল লাগবে তার কোন মানে নেই, কিন্তু সেবাগ্রাম যে আজকের যুগে বিস্ময়কর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেবাগ্রামের ইতিহাসটুকুও কিন্তু কম বিস্ময়কর নয়। গ্রামীণ কুটির শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়ার্ধায় এলেন। আশ্রয় নিলেন মগনওয়াদী গ্রামে। গ্রামের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। তিনি আশেপাশের গ্রামগুলি পরিদর্শন করে করে গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকলেন। সেই সঙ্গে তাঁর সেবাগ্রামও চলতে লাগল। তিনি বালতি ও ঝাঁটা হাতে নিকটবর্তী সিন্দি গ্রামে গিয়ে পথ-ঘাট পরিষ্কার করতেন। তাঁর দেশী-বিদেশী শিষ্যরা সর্বদা সঙ্গে থাকতেন।

কিছুদিন বাদে গান্ধীজীকে গ্রামসেবায় সাহায্য করার জন্য শ্রীমতী মীরাবেন এলেন সিন্দি গ্রামে। কিন্তু সিন্দিকে পছন্দ হল না তাঁর। সিন্দি শহরের বড় বেশি কাছে। তাকে ওয়ার্ধার শহরতলি বলা যেতে পারে। গ্রামদরদী মীরাবেন শহরের প্রভাবশূন্য প্রকৃত একটি গ্রামকে গ্রামসেবার কেন্দ্র করতে চাইলেন। মনের মতো একটি গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেল ওয়ার্ধা থেকে চার মাইল দূরে। গ্রামটির নাম সেগাঁও। এই গ্রামের প্রায় তিন চতুর্থাংশের মালিক ছিলেন গান্ধীশিষ্য শেঠ যমুনালাল বাজাজ। তিনি আনন্দে মীরাবেনকে তাঁর গ্রামে কুটির বাঁধার অনুমতি দিলেন। ১৯৩৫ সালের শেষদিকে মীরাবেন সেগাঁও গ্রামে এসে বসবাস শুরু করলেন। গ্রামটির স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডের স্থায়ী আবাস ছিল সেগাঁও। তখন গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ৬০০ জন। সকলেই কৃষক কিংবা দিন-মজুর। গ্রামবাসীদের এক তৃতীয়াংশ ছিলেন হরিজন। মীরাবেন গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

কিছুদিন বাদে গান্ধীজী আনন্দিত হলেন মীরাবেনের সিদ্ধান্তে। ১৯৩৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তিনি গরুর গাড়িতে করে সিন্দি থেকে রওনা হলেন সেগাঁও। তখন পথ বলতে কিছুই ছিল না। উঁচু-নিচু মাঠের মধ্য দিয়ে হেলে-দুলে গাড়ি চলল। বসে থাকা দায় হল। গান্ধীজীকে অধিকাংশ পথই পায়ে হেঁটে পেরোতে হল। তবু তিনি এলেন এখানে। চার-পাঁচদিন থাকলেন এই গ্রামে। গ্রামটি পছন্দ হল। তিনি এখানেই তাঁর আশ্রম নির্মাণের স্থান নির্বাচন করলেন। যমুনালালজী এক একর জমি দিলেন। কুটির নির্মিত হল।

১৯৩৬ সালের ১৬ই জুন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে গান্ধীজী তাঁর নতুন আশ্রমে আগমন করলেন। অনতিকাল পরে অনিবার্য কারণে গান্ধীজী সেগাঁওয়ের নতুন নামকরণ করলেন সেবাগ্রাম – গ্রাম সেবার আদর্শ স্থান। সেই নামেই সে আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত।

সেই বিশ্ববিখ্যাত গ্রামটিতে আজ এসেছি আমরা। গান্ধীজী সেদিন যে মাঠ-ভাঙা পথ দিয়ে গরুর গাড়িতে করে এখানে এসেছিলেন, সেই পথ এখন বাঁধানো মোটরপথে পরিণত। নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে সমতা রেখে পথের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত হয় নি এই আশ্রম। গান্ধীজীর আমলে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি রয়েছে। তাই সেবাগ্রামে কেবল গ্রাম সেবার আদর্শ নিকেতন নয়, সে ভারতের মহাতীর্থ।

দর্শন শেষে দেখা করি শ্রীমতী আশাদেবীর সঙ্গে। আমাদের দেখতে পেয়ে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলেন তিনি। ভারীখুশি হলেন। খুশি হলাম আমরাও, এমন মহীয়সী বাঙালী মহিলার দর্শন পাওয়া পরম সৌভাগ্য। বয়সে প্রবীণা হলেও আশাদেবীর মনটি শিশুর মতো সরল। বড় ভাল লাগল তাঁকে। এত ভাল না হলে বোধকরি এমন পরিবেশে বাস করা যায় না।

আশাদেবী আমাদের নিয়ে এলেন তাঁর স্বামী ও আশ্রমের বর্তমান কর্ণধার ই. ডাবলু. আর্যনায়কমের কাছে। সিংহলী হলেও চমৎকার

বাংলা বলতে পারেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদ রচনায় আত্ম-সমাহিত জীবন-সন্ধানী তপস্বী শিক্ষককে দেখে ভাল লাগে আমাদের। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

আর্যনায়কমজী জন্মগ্রহণ করেছেন কলম্বোর কাছে ভাদ্দোকোদ্দাই গ্রামে। তিনি ধর্মে খৃষ্টান কিন্তু কর্মে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর ধারায় ভারতীয় হিন্দু। তিনি একজন আদর্শ বিশ্ব-নাগরিক। বিশ্ব-পর্যটকও বটে।

তাঁর পিতামহ চার্চ অব্ ইংলণ্ড প্রতিষ্ঠিত সিংহলের জাফ্না কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানেই প্রথম পড়াশুনা করেছেন আর্যনায়কমজী। পরে তিনি আমাদের শ্রীরামপুর কলেজ থেকে 'ব্যাচিলর অব্ ডিভিনিটি' ডিগ্রি লাভ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ প্রাচ্যের প্রাচীনতম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক মহাবিদ্যালয়।

উচ্চতর শিক্ষা গ্রহনের জন্য আর্যনায়কমজী বিলেতে যান। সেখানে তিনি নেতাজী সুভাষের সহপাঠী ছিলেন।

কবিগুরুর সঙ্গে আর্যনায়কমজীর প্রথম দেখা হয় প্যারিসে। দেখা-মাত্রই কবি তাঁকে ভালোবেসে ফেললেন। তিনিও সানন্দে কবির ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্গী হলেন।

কিছুদিন বাদে আর্যনায়কমজী চলে এলেন ভারতে। যোগ দিলেন বিশ্বভারতীতে। হলেন কবির একান্ত সচিব ও শিশুশিক্ষা বিভাগের রেক্টর। অকস্‌ফোর্ডে হিবার্ট লেক্‌চার দেবার সময় এবং রাশিয়া ও আমেরিকা ভ্রমণে তিনি ছিলেন কবির সংগী। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়েই তিনি আশাদেবীকে বিয়ে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে উৎসাহিত হয়ে এই আন্তঃধর্ম ও আন্তঃর্দেশীয় বিয়ে দিয়েছিলেন।

আর্যনায়কমজী দশ বছর কবিগুরুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তারপরে কবির নির্দেশে সেবাগ্রাম উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে চলে এলেন এখানে। সেই থেকে তিনি আছেন সেবাগ্রামে। আছেন ভারতের সনাতন আদর্শকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করতে, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। শুনে ভাল লাগল যে সেবাগ্রামও রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত নয়।

মহাভারতের মহাতীর্থে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি আশ্রম থেকে। টাঙ্গা এগিয়ে চলে রেলস্টেশনের দিকে। মেঘ-মুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তার মধুর আলোয় সেবাগ্রামের গ্রাম্যপথ হয়েছে আলোকিত। এই আলোয় আলোকিত করে তুলতে হবে সারা ভারতকে। নইলে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির মৃত্যু হবে। আমাদের মহান অতীত মিথ্যে হবে। কবিগুরু মহাত্মাজী নেতাজী ও আর্যনায়কমজীর সকল সাধনা ব্যর্থ হবে।

'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥'

'Where Ramgiri's Shadowy woods extend,
And those pure streams where Sita bathed descend,
Spoiled of his glories, severed from his wife,
A banished Yaksha passed his lonely life,
Doomed by Kuvera's anger to sustain
Twelve tedious months of solitude and pain···'

অনুবাদ করেছেন Horace Hayman Wilson. অমরকাব্য 'মেঘদুতম্'-এর ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রথম অনুবাদ। উইলসনের এই সরল ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেশে-বিদেশে বিশেষ সমাদৃত হয়। অনুবাদ-খানি ১৮১৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

আজ মনে পড়েছে বিরহী যক্ষ ও তাঁর বিরহিণী বধূর কথা। মনে পড়েছে বিশ্বের বিচিত্রতম কাব্যের কবি কালিদাসের কথা। মনে পড়ছে উজ্জয়িনী ও রামগিরির কথা।

যক্ষ আর তাঁর বধূ বহুদিন বিদায় নিয়েছেন এ পৃথিবী থেকে। কবি আজ নেই আমাদের মাঝে। কিন্তু আছে তাঁর মেঘদূত। আছে উজ্জয়িনী আর রামগিরি। সেখানকার মানুষের আজ বিরহী যক্ষ ও তাঁর বধূর কথা মনে পড়ে কিনা জানি না। কিন্তু মনে পড়ে আমাদের। মেঘদূত পাঠরত মানুষের আজও বার বার মনে পড়ে উজ্জয়িনী ও রামগিরিকে।

উজ্জয়িনী নয় রামগিরি, নির্বাসিত যক্ষ যেখান থেকে

'···বন্ধনবিহীন

নবমেঘপক্ষ—'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা…'

আজ আমরা চলেছি সেই রামগিরি। তাই বার বার মনে পড়ছে মেঘদূতের কথা।

আমরা পাঁচজন। চারুবাবু (জরাসন্ধ), কাকা, মনোজ, পশুপতি ও আমি। নাগপুর থেকে রামগিরি ৩০ মাইল। তবে এখন আর সে রামগিরি নয়--রামটেক্। 'টেক' শব্দটি 'টিকিয়া' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। টিকিয়া মানে পর্বতশিখর। শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পর্বতশিখর রামটেক্।

সকাল ন'টায় ট্যাক্সি ছাড়ল এম. এল. এ. হস্টেল থেকে। চল্লিশ টাকায় যাতায়াত ঠিক হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা নাগপুর শহর ছাড়িয়ে এলাম। পথের দু'ধারে আম জাম নিম্‌গাছ। দু'পাশে ক্ষেত আর কমলালেবুর বাগান।

কিছুদূর এসে কাম্‌টি ক্যান্টনমেণ্ট। তারপরে কানহান নদীর পুল পেরিয়ে রেললাইন ছাড়িয়ে পথ বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। সুন্দর ও মসৃণ পথ। মাঝে মাঝে ছোট বড় গ্রাম।

ভাবতে ভাল লাগছে একদিন এই পথে পদচারণা করেছিলেন মহাকবি কালিদাস। কালিদাস কেবল কবি ছিলেন না, ছিলেন একজন দুঃসাহসী পর্যটক। অভিজ্ঞান্ শকুন্তলম্, রঘুবংশম্, কুমার সম্ভবম্ ও মেঘদূতম্ কেবল কাব্যগ্রন্থ নয়, ভ্রমণ কাহিনীও বটে।

একটা বাঁক নিতেই দূরে, বাঁ দিকে, গাছে ছাওয়া সবুজ পাহাড়টি দেখতে পেলাম। পাহাড়ের পাদদেশে জনপদ। মনোজ বলল, "রামটেক্।"

পশুপতি বলল, "না, রামটেক্ নয়। আমরা আগে খিন্দ্‌সী হ্রদ দেখে আসি, তারপরে পাহাড়ে উঠব।"

ড্রাইভার বলল, "না" খিন্দ্‌সী নয়। রামটেক্। খিন্দ্‌সী যাবার কোন কথা ছিল না আমার সঙ্গে।"

অতএব কলহ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কলহ চলল। অবশেষে সাব্যস্ত হল, সবারই ভুল হয়েছে। আমরা তাকে বিশেষ করে খিন্দ্‌সীর কথা বলি নি। আর ড্রাইভারও বুঝতে পারে নি, 'সব দেখিয়ে দিতে হবে' বললে খিন্দ্‌সীটাও বোঝায়। যাই হোক্, সবারই যখন ভুল হয়েছে, তখন ড্রাইভার আমাদের নিয়ে যাবে খিন্দ্‌সী, তবে তাকে কিছু বক্‌শিশ দিতে হবে।

রেলগাড়িতে করেও রামটেক্ আসা যায়। স্টেশন এখান থেকে মাইলখানেক আর সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত পথে মন্দির দেড় মাইল। স্টেশনের কাছে ও শহরে ছুটি ধর্মশালা আছে। পাহাড়ের ওপরে আছে একটি ডাকবাংলো।

শহরকে বাঁদিকে রেখে আমরা চললাম এগিয়ে। চললাম রামটেক্ পাহাড়ের পাশ দিয়ে। এক সময় পাহাড় শেষ হয়ে যায়। আমরা এগিয়ে চলি।

ছ' মাইল এগিয়ে একটি হ্রদের তীরে এসে থামল গাড়ি। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

বহুবিস্তৃত জলাশয়। পূর্ববঙ্গে হলে বলতাম বিল। এখানে বলে তালাও—খিন্দ্‌সী তালাও। তবে বিলের সঙ্গে পার্থক্য আছে। হ্রদের এপারে বেশ বড় একটি টিলা আর ওপারে ক্ষেত ছাড়িয়ে পাহাড়ের কালো রেখা। বিলের ধারে পাহাড় নেই পূর্ববঙ্গে। আর বিলের পাড় হয় না এমন প্রস্তরপরিপূর্ণ।

টিলার পাশ দিয়ে আমরা নেমে এলাম হ্রদের তীরে। জায়গাটি ভারী সুন্দর—চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। ছায়াশীতল, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। ফুটে আছে জানা-অজানা অসংখ্য বনফুল। প্রজাপতিরা ছুটোছুটি করছে। শিকারের চেষ্টায় ছুয়েকটি গাংচিল ও বক উড়ে বেড়াচ্ছে। হ্রদের বুকে মেঘের ছায়া পড়েছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি ভেজা নীলাকাশ উঁকি দিচ্ছে।

রমণীয় পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে উঠে এলাম ওপরে। এখানে

একটা লক্ গেট রয়েছে। এই হ্রদটির সরকারী নাম **Ramtek** Reservoir বা রামটেক্ জলাধার। একটি খাল কেটে হ্রদের জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভাণ্ডারার কৃষিক্ষেত্রে। সেখানকার ২৬,০০০ একর জমিতে জল-সেচন করা হচ্ছে। খালের জল নিয়ন্ত্রণের জন্য এই লক্ গেট।

ড্রাইভার এখান থেকে ফিরতে চাইছিল, কিন্তু মনোজ আর পশুপতির জন্য পেরে উঠল না। ওরা বলল, "ডাকবাংলো দেখব।"

অতএব নিরুপায় ড্রাইভার আমাদের নিয়ে চলে! মাইলখানেক এসে রাস্তার বাঁ দিকে ডাকবাংলো। নাগপুর নির্মাণ বিভাগের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (সেচ শাখা) এই বাংলোর কর্তা।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। পাথরকুচি ছড়ানো পথ। পথের দু'দিকে ফুল বাগান। বাগানের শেষে বাঁধানো অঙ্গন। একদিকে খিন্দ্সী—অনেক নিচে। আর একদিকে ডাক-বাংলো। চমৎকার অবস্থান। জনৈক মারাঠী লেখক এই রমণীয় আবাসে বসে একখানি উপন্যাস লিখেছেন।

বাংলোর পেছনে হলিডে ক্যাম্প। দু'খানি ঘরের দু'টি ব্লক। প্রতি ব্লকের দৈনিক ভাড়া চার টাকা।

রোববার নাগপুর থেকে সরকারী ট্যুরিস্ট বাস এখানে আসে। অন্যান্য দিন বে-সরকারী বাস রামটেক্ আসে। সেখান থেকে টাঙ্গা করে এখানে আসা যায়।

কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা এসে গাড়িতে উঠলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি এসে থামল আম্বালা গেটের সামনে। রামটেক্ পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট এক দীঘির নাম আম্বালা তালাও বা আম্বালা সাগর। দীঘির পাড়ে একাধিক মন্দির। রাম নবমী ও কার্তিক পূর্ণিমাতে এখানে মেলা বসে। সত্তর বছর আগেও সে মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত।

তালাও ছাড়িয়ে একটু উঠে এসে খানিকটা সমতল জায়গা।

একসারি সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ে। কয়েকধাপ সিঁড়ি উঠে তোরণ —আম্বালা গেট। এখানে এসে বিশ পয়সা করে প্রবেশমূল্য দিতে হল। এটি রামটেক্ দর্শনের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবেশ তোরণ।

গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চারুবাবু বলেছিলেন—পারব কি অত উঁচুতে উঠতে ?

বলেছিলাম—'পারবেন না কেন ? নিশ্চয়ই পারবেন।'

—পরিব্রাজক, তোমার ভরসাতেই যাচ্ছি। নইলে বুড়ো বয়সে এ উৎকট শখ হত না। এখান থেকেই একটি প্রণাম করে, মনে মনে মহাকবি কালিদাসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতাম।

কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে তিনি কিন্তু বলে উঠলেন, "না হে পরিব্রাজক, তুমি ঠিকই বলেছো। পারব বলেই তো মনে হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক উঠে যাব যক্ষালয়ে।"

মনে হবার কারণ আছে। সাধারণ সিঁড়ি। বেশ প্রশস্ত। কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরে খানিকটা সমতল জায়গা। পথের পাশে বড় বড় গাছ। গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য বড় বড় পাথর। ধীরে-সুস্থে সিঁড়ি ভাঙছি আমরা।

মারাঠা আমলে এই পাহাড়ের ওপরে দুর্গ নির্মিত হয়। সেকালে ঘোড়াই ছিল সৈনিকদের শ্রেষ্ঠ বাহন। ঘোড়া আসার জন্য তৈরি হয়েছিল এই পথ। ঘোড়া যে পথে পাহাড়ে উঠতে পারে, মানুষের কাছে তা কঠিন হতে পারে না।

কিছুদূর এসে আর একটি তোরণ। তোরণ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। চলা শুরু করার পর থেকেই মাঝে মাঝে ওদের দুয়েকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু এখানে দেখছি ওরা অসংখ্য। পথে পাহাড়ে গাছে সর্বত্র ওরা। মনোজ বলল, "আর একবার রামটেক্ দর্শনের দর্শনী দিতে হবে এখানে, এই হনুমানদের।"

"কিন্তু তা পাব কোথায় ? কিছুই যে কিনে আনি নি।" কাকা সবিশেষ চিন্তিত।

তাঁকে চিন্তামুক্ত করে পশুপতি। বলে, "কেন, ঐ যে লোকটি ছোলা নিয়ে বসে আছে।"

এবারে তাকে দেখতে পাই আমরা। পথের ধারে বস্তা পেতে ছোলা বেচতে বসেছে। তার চারদিকে গোল হয়ে বসে আছে হনুমানের দল!

ছোলা কিনে পরিবেশন করা হল রামটেক্ নিবাসী রামানুচরদের মধ্যে। ওরা আমাদের পথ ছেড়ে দিল। চলতে চলতে দোকানীকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি ওদের মাঝে এভাবে ছোলা নিয়ে বসে আছো, ওরা কেড়ে খায় না?"

"না। সাহস পায় না।" জবাব দেয় সে। ছোট একখানি ছড়ি দেখিয়ে বলে, "এই দেখুন না আমার লাঠি রয়েছে।"

দোকানীকে কিছু না বলে এগিয়ে চলি। কিন্তু সন্দেহ ঘোচে না। অতটুকু ছড়ি দিয়ে এতগুলি হনুমানকে ভয় দেখানো যায় কী?

মনোজ বলে, "আসলে হনুমানরা কখনই হামলা করে না ওর ওপরে। তারা জানে একদিন কেড়ে খেলে, পরদিন থেকে দোকানী আর বসবে না এখানে।"

"তাছাড়া এ হনুমানরা হল গিয়ে দোকানীর বিজ্‌নেস পার্টনারস্।" কাকা বলেন, "ওরা আছে বলে এর ছোলা বিক্রি হচ্ছে। আর সে এখানে বসছে বলেই ওরা ছোলা খেতে পাচ্ছে।"

চারুবাবু সমর্থন করেন কাকাকে। বলেন, "ঠিকই বলছেন। মিউচুয়্যাল ইন্‌টারেস্ট বলেই ওরা শান্তিতে সহাবস্থান করছে।"

চারশ' ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একটা চটিতে পৌঁছলাম। পথের খানিকটা অংশ সমতল। ওপরে পাতার ছাউনি। পথের ডানদিকে কয়েকখানি ঘর ও একটি চা-মিষ্টির দোকান। বাঁদিকে দত্তাত্রেয় মন্দির।

দোকানী বসতে বলে আমাদের। চেয়ার নামিয়ে দেয়। কাপড়ের বদলে কাঠ আর দড়ি দিয়ে তৈরি ইজিচেয়ার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে

জল খেয়ে উঠে দাঁড়াই আমরা। মন্দিরে প্রণাম করে দোকানীর কাছ থেকে বিদায় নিই। সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলি।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল। আমরা শিখরে পৌঁছে গেছি। পথটি ডাইনে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে একটি ভগ্ন মসজিদ। তার পেছনে সুউচ্চ প্রাচীর। বাঁ দিকে পথের পাশে দুটি মিষ্টির দোকান। এখানেও ওপরে পাতার ছাউনি। দোকানের সামনে টেবিল-চেয়ার। দোকানীরা আমাদের আমন্ত্রণ করে।

খুব পরিশ্রান্ত না হলেও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। একটা দোকানে এসে বসি। বসেই বলে ওঠেন চারুবাবু, "দেখলে পরিব্রাজক, ইচ্ছে করলে এখনও মাউন্টেনিয়ারিং করতে পারি।"

সহাস্যে ঘাড় নেড়ে তাঁর উক্তি সমর্থন করি।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উঠে দাঁড়াই। সমতল পথটুকু পেরিয়ে এক সারি সিঁড়ির সামনে আসি। ষোল ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষে তোরণ। তোরণ থেকে দুদিকে প্রাচীর প্রসারিত। বুঝতে পারি দুর্গের প্রয়োজনে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল।

তোরণের ডানদিকে বরাহ মন্দির। পাথরের বরাহ মূর্তি। ভক্তদের তেল ঘি ও সিঁদুরে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। রক্তের সঙ্গে এখানকার একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল পরবর্তীকালে। রামটেক্ কেবল তীর্থ নয়, দুর্গ।

মারাঠীরা এ বরাহমূর্তিকে দেবজ্ঞানে পুজো করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই মূর্তির পায়ের ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারলে, সব পাপ দূর হয়ে যায়।

পাপ দূর করে, আমরা এসে দাঁড়াই পাথর বাঁধানো আঙ্গিনায়। প্রাচীর পরিবেষ্টিত পর্বতশিখর। শিখরটি সুবিরাট ও সুসমতল। প্রাচীরের সঙ্গে সারি সারি ছোট ছোট ঘর—সেকালের সেনানিবাস।

পর্বতশিখরকে সমতল করে নির্মাণ করা হয়েছিল দুর্গ। অশ্বারোহীদের জন্য পথ তৈরি করা হয়েছিল, যে পথে আমরা

এসেছি। কিন্তু কোন দুর্গেরই একটি মাত্র পথ থাকতে পারে না। তাই পাহাড়ের অপর দু'দিক দিয়ে আরও দু'সারি সিঁড়ি নির্মিত হয়েছিল। বাঁ দিকের সিঁড়ি নেমে রামটেক্ বাজারের কাছে। অধিকাংশ যাত্রী এই সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া-আসা করেন। কারণ বাস রামটেক্ বাজার পর্যন্ত আসে। রামটেক্ বাজার থেকে আম্বালা গেট বহুদূর। তাছাড়া এ পথটি একটু খাড়াই হলেও অনেক সংক্ষিপ্ত।

ডানদিকের সিঁড়ি একেবারে খাড়া। নেমে গেছে পাহাড়ের অপর দিকে, যেদিক বনবিভাগের অধীনে। লোকালয়হীন বলে ওদিক থেকে কেউ আসা-যাওয়া করে না। পথটি এখন অব্যবহৃত।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রাম-সীতার মন্দির—রামটেকের মূল-মন্দির। পরে দর্শন করব বলে আমরা আগে আসি শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে। ছোট মন্দির। ভেতরে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি—ভারী সুন্দর।

তারপরে এলাম জৈনমন্দিরে। এককালে রামটেক্ ছিল জৈন-তীর্থ। পরবর্তীকালে সেই তীর্থ পরিণত হয়েছিল দুর্ভেদ্য দুর্গে। দুর্গনির্মাতারা ভিন্ন ধর্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও জৈনমন্দির ধ্বংস করে ফেলেন নি। এই মহানুভবতার জন্যই আসমুদ্র হিমাচল সেদিন মহারাষ্ট্রের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল।

জৈনমন্দির দেখে আমরা এলাম অগস্ত্যমুনির মন্দিরে। প্রায়ান্ধকার ক্ষুদ্র একখানি ঘর। এক কোণে আগুন জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে ভস্মস্তূপ। ওরা বলেন—এখানেই ছিল মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রম আর এই তাঁর যজ্ঞকুণ্ড—সেই থেকে জ্বলছে।

বনবাসের দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। দণ্ডকারণ্য থেকে রামলক্ষ্মণ ও সীতা এলেন অগস্ত্যের তপোবনে। অগস্ত্য পরমসমাদরে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। পরদিন প্রভাতে রাম লক্ষ্মণ সীতা স্নান ও তর্পণ শেষে মহামুনির চরণ বন্দনা করলেন। তাঁদের আশীর্বাদ করে অগস্ত্য বললেন—গোদাবরী তীরে দিব্য আয়তন পঞ্চবটী বনে গিয়ে তোমরা

বাস করো। তিনি রামচন্দ্রকে বিশ্বকর্মা নির্মিত দিব্য ধনুর্বাণ ও নানা আভরণ দান করলেন।

এই সেই মিলন-মন্দির, সেই তপোবন, সেই পরম পুণ্যস্থান—আমরা প্রণাম করি।

অনেকে বলেন, একালের এই রামগিরি হচ্ছে সেকালের চিত্রকুট পর্বত। তাহলে তো এ আশ্রম অগস্ত্যমুনির হতে পারে না। কারণ চিত্রকুট পর্বতে অগস্ত্যমুনির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের দেখা হয় নি।

লক্ষ্মণ মন্দিরে আসি। সামনে গোলাকার নাট-মন্দির। তারপরে ছোট পাথরের মন্দির। দরজা দুটি পেতল ও রুপো দিয়ে তৈরি। ভেতরে রুপোর সিংহাসনে কালো পাথরের দণ্ডায়মান লক্ষ্মণমূর্তি—ভ্রাতৃভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক।

নাট-মন্দিরের এককোণে তিনটি পুরনো বন্দুক, একটি কুঁদা ও তিনখানি তরোয়াল আর মারাঠী আমলের কয়েকখানি ছবি—দেওয়ালে টাঙানো। কাছেই দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে মেঝেতে রাখা হয়েছে একখানি হাতে আঁকা রঙীন চিত্র—'Kalidas reciting Meghdhuta to king Vikramaditya and Nabaratna' by Asit Kumar Halder.

কবি কালিদাসের আর কোন স্মৃতি নেই এখানে। শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এলাম রাম-সীতা মন্দিরে। রামটেকের মূল-মন্দির। দেওয়াল ঘেরা নাট-মন্দিরের শেষে মূল-মন্দির। তেমনি পেতল আর রুপোর দরজা। রুপোর সিংহাসনে রাম-সীতার মূর্তি। ওপরে চাঁদোয়া টাঙানো—ঘণ্টা ঝুলছে।

নাট-মন্দিরের একপাশে অনেকগুলি বন্দুক, তরোয়াল ও পিস্তল। লক্ষ্মণ মন্দিরের মতো এগুলিও মারাঠী আমলের। এরা যাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহারাষ্ট্রের সেই গৌরবময় যুগের কথা, যে যুগস্রষ্টার 'মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি

দিবে বিনা রণে,...

মৃত্যুহীন বাণী-রূপে আনি দিবে নূতন পরান —

নূতন প্রভাত॥'

সেই মহাবীরের মহান আত্মাকে প্রণাম করি —'জয়তু শিবাজি'।

প্রাঙ্গণের প্রান্তে রাম-সীতা মন্দিরের বাঁ দিকে কৌশল্যা, শিব ও সত্যনারায়ণের মন্দির। শিব মন্দিরের বাইরে শিবলিঙ্গ ও ভেতরে শ্বেতপাথরের শিবমূর্তি। সত্যনারায়ণ মন্দিরের বাইরে গরুড় মূর্তি, ভেতরে শ্বেতপাথরের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী মূর্তি।

রাম-সীতা মন্দিরের পেছনে, দেওয়ালের ধারে লব-কুশ মন্দির। ভেতরে পাথরের বেদীর ওপরে লব-কুশের প্রস্তর মূর্তি। মন্দিরের পেছনে ছাদে উঠবার সিঁড়ি।

ছোট ছাদ। কিন্তু এখানে উঠে আসতেই আমাদের সামনে উন্মোচিত হল সেই দৃশ্য, যা দেখে মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন বিশ্বের বিচিত্রতম কাব্য।

আজকের রামটেকের সঙ্গে সেদিনের রামগিরি আশ্রমের পার্থক্য প্রচুর। আজ একদিকে দেখতে পাচ্ছি মন্দির ও প্রাচীন দুর্গ। আর একদিকে—নিচে, পাহাড়ের পাদদেশে নতুন শহর রামটেক্। লাল টালি আর সাদা টিনের অসংখ্য ছোট-বড় বাড়ি। মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা কাঁচা-পাকা পথ। পথের প্রান্তে মন্দির আর জলাশয়। এসব কিছুই ছিল না কবি কালিদাসের কালে। তাই বলে কি সেকাল চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে? সে রামগিরি আশ্রম কি চিরতরে বিদায় নিয়েছে?

না। সেকাল বেঁচে আছে মানুষের মনে—বিরহ আর মিলনের মাঝে। সে আশ্রম মিশে আছে দূরের ঐ পাহাড়ে আর বনে— শাশ্বতী প্রকৃতির মাঝে।

শহরের সীমান্তে সবুজ-সোনালী ক্ষেত আর ছোট-ছোট জলাশয় —সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে।

ক্ষেতের শেষে লালমাটি আর কাঁটাবন। তারপরে ধূসর পাহাড়
পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘের সমারোহ। মেঘ নয়, মেঘদূত—

'তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত-গঙ্গা-দুকুলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্‌গারমুচ্চৈ-র্বিমানা,
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্॥'

'কৈলাস গিরির অঙ্গে, যেন প্রিয়তমোৎ সঙ্গে,
অলকানগরী শোভে, যার
গলিত দুকুল প্রায়, গঙ্গানদী, হেরি তায়,
সন্দেহ হবে না মনে আর।
উন্নত বিমানজালে, যে পুরী জলদ কালে,
ধরি মেঘ, ক্ষরে জল যায়।
শোভে যেন কুলনারী, অলকাজড়িত যারি,
সুবিমল মুকুতা মালায়॥'

—০—